নিউ ভার্সন অফ লাভ



হাবিবুর রহমান মিছবাহ



নিউ ভার্সন অফ লাভ

নিউ তাসনিম

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

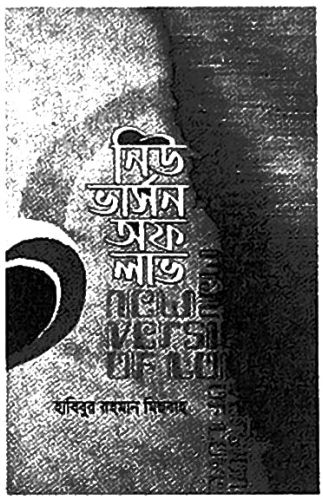
https://t.me/islaMic_fdf



নিউ ভার্সন অফ লাভ

হাবিবুর রহমান মিছবাহ

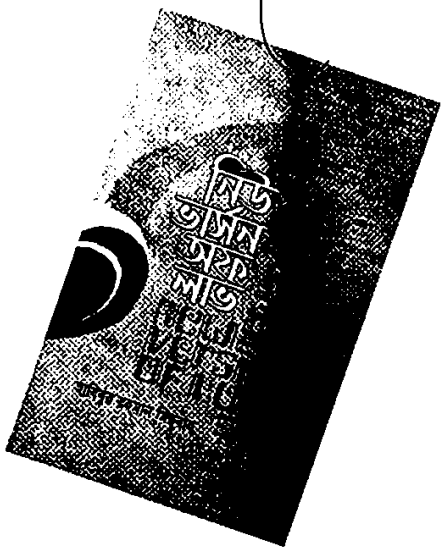
আত তাকওয়া পাঠাগার
৩০৮ দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ১২৩৬
০১৯৪১-৬৮৬৪৯৫, ০১৭১২-৩৭৯৭৪৮



নিউ ভার্সন অফ লাভ	হাবিবুর রহমান মিছবাহ
প্রথম প্রকাশ	একুশে বইমেলা ২০১৯
দ্বিতীয় প্রকাশ	মার্চ ২০১৯
দ্বিতীয় সংস্করণ	নভেম্বর ২০১৯
পরিমার্জিত ও সম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণ	১ জানুয়ারি ২০২০
”	লেখক
পরিবেশক	আত তাকওয়া পাঠাগার ৩০৮ দনিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা ১২৩৬ ০১৯৪১-৬৮৬৪৯৫, ০১৭১২-৩৭৯৭৪৮
অনলাইন পরিবেশক	www.rokomari.com
শুভেচ্ছা মূল্য	দুইশো টাকা (বিক্রিমূল্য)
New Version Of Love	by Habibur Rahman Misbah Published by At Taqwa Pathagar Price : 200.00 Tk

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf



নিউ ভার্সন অফ লাভ

NEW VERSION OF LOVE

১

মাহিন ঘরের মেঝ ছেলে। বেশ মেধাবী। পড়ালেখায়ও যথেষ্ট মনোযোগী। দুষ্টুমী যে করে না তেমনটিও নয়। পাড়ার সবাইকে সজাগ রাখতে মাহিনের জুড়িমেলা ভার। বাবা জমির উদ্দীন পেশায় কৃষক। মা আমেনা বেগম গৃহিনী। বাবা-মা'র আবদারের জায়গা ঐ মাহিনই। পড়ালেখার পাশাপাশি প্রাইভেট পড়িয়ে বাবাকে সহযোগিতা করে মাহিন। বড়ছেলে রাশেদকে নিয়ে বাবা-মা'র বড়স্বপ্ন থাকলেও বরাবরই স্বার্থপর ভূমিকা পালন করেছে সে। রাশেদ পেশায় দোকানদার। স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা থাকে। একমাত্র বোন সাবিনা আক্তার মাধ্যমিকের মেধাবী ছাত্রী। বাবা, মা ও তিনভাই-বোনের পরিবার মাহিনের।

মাহিন সংসারের জন্য ত্যাগী হলেও অন্যান্য সদস্যের ভালোবাসায় সিক্ত হতে পারেনি কখনও। কোনো একঅদৃশ্য কারণে সংসারে সবার অবহেলার পাত্র সে। মাঝে মাঝে ভাবে– সবাইকে ছেড়ে কোথাও চলে যাবে, কিন্তু বাবা-মা ও ভাই-বোনের ভালোবাসা বাধা হয়ে দাঁড়ায় বার বার। তাই চাপা কষ্ট ধারণ করেই জীবন বয়ে বেড়ায় মাহিন। ক্লাসের ফাঁকে কলেজের পেছনে গাছের ছাঁয়ায় আকাশের দিকে অপলক তাকিয়ে কী যেন ভাবে প্রায়সই। বিরতিতে সবাই যখন খেলাধুলা কিংবা খুনসুটিতে মেতে থাকে– মাহিন তখন আপনজনের অবহেলার যন্ত্রণা নিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন! তবে এসব সবার চোখের আড়ালেই থেকে যায়।

মাহিন কাউকে বুঝতে দেয় না, কতটা যন্ত্রণা বয়ে বেড়ায় সে। সবার সঙ্গে হাসিখুশি আর আমেজী মেজাজেই থাকে সবসময়।

২

তবে একজনের নজর কখনই এড়াতে পারে না মাহিন। মাহিন নিজেও জানে না– কেউ তাকে ফলো করছে। দুষ্টু প্রকৃতির হলেও বরাবরই লাজুক সে!

একদিন কলেজের পেছনের সেই গাছের নিচে মনমরা হয়ে বসেথাকে মাহিন। লোকচক্ষুর আড়ালে আর কতদিন থাকা যায়? আরও যদি কেউ ফলো করে– তবে তো কথাই নেই। ছোট ছোট কদমে কেউ একজন মাহিনের দিকে এগিয়ে যায়। মাহিন গভীর ধ্যানে মগ্ন।

মাহিন কাঁদছে! না, এত হাসিখুশি ও চঞ্চল ছেলে কাঁদবে কেন! ওর চেহারা দেখে কখনই বোঝা যায় না– ও কোনো দুঃখে আছে। আরও কাছে চলে যায় সে। ঝরে পড়া শুকনো পাতায় পা লেগে খসখস শব্দে হৎচকিয়ে ওঠে মাহিন! অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে যায়। বুকে ফুঁ দিয়ে পেছন ফিরে তাকায়–

–হঠাৎ তুমি এখানে? এভাবে চুপি চুপি এলে যে?

–আচ্ছা তুমি কি ভয় পেয়েছ? প্রশ্ন করে আগন্তুক। উত্তরে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে মাহিন।

–তুমি এখানে কেন?

–এমনিতেই এলাম। অনেকদিন ধরে দেখছি তুমি নীরবে কী যেন ভাবো।

লজ্জায় মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মাহিন। আগন্তুক আবার জানতে চায়– তোমার মাঝে এমন কী কষ্ট আছে, যার জন্য একাকি সময় কাটাও? তোমাকে দেখে তো অসুখী মনে হয় না! তুমি অন্যায় দেখে দৃঢ়চিত্তে প্রতিবাদ করো, সবাইকে হাসি-আনন্দে মাতিয়ে রাখো, ক্লাসের ফার্স্টবয়, তোমার এমন ভেঙ্গে পড়া মানায় না!

মাহিনের চোখ ছলছল। চোখের পানি লুকাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় মাহিন। আগন্তুকের প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে চলে যায় সেখান থেকে।

মাহিনের পথ চেয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে মাসনা। হ্যাঁ, সেই আগন্তুকের নাম মাসনা। মাহিনের ক্লাসমেট। খুব মিষ্টি মেয়ে। একই কলেজে ইন্টারে পড়ে। মাসনা কলেজের সবচেয়ে সুন্দরী ও চঞ্চল মেয়ে। মাহিনদের পাশের গ্রামেই মা-বাবার সঙ্গে থাকে। তবে ছেলেদের পাত্তা দেয় না একদম!

মাহিনকে আপন করে পাওয়ার স্বপ্নদেখে বহুদিন ধরে। তবে কখনও বলার মতো সাহস করতে পারেনি মাসনা। দূর থেকে মাহিনকে ফলো করে।

৩

মাহিন মনখোলা মানুষ। কারও পেছনে দোষ গেয়ে বেড়ায় না। বহুপ্রতিভার অধিকারী বলে অকর্মণ্যরা হিংসা করে মাহিনকে। অন্যদের হিংসা-ই মাহিনের প্রতি আসক্ত করে তুলে মাসনাকে। মাসনার বান্ধবীরাও মাহিনকে ততটা পছন্দ করে না। মাহিন কাউকে কেয়ার করে না বলে বান্ধবীরা তাকে অহঙ্কারী বলে জানে। মূলত হিংসা বা অহঙ্কার নয়, মেয়েদের দিকে তাকাতে লজ্জা পায় মাহিন। মেয়েদের সঙ্গে ক্লাসের ছেলেরা হাসিঠাট্টা করুক, আড্ডায় মেতে উঠুক, এসব পছন্দ করে না সে। ফলে কেউ কেউ একরোখাও বলে। তবে কলেজের শিক্ষকদের প্রিয়পাত্র মাহিন। ভদ্রতা, সততা কিংবা আচরণ, সবদিক দিয়েই এগিয়ে সে।

৪

মাসনা ভাবনায় পড়ে যায়। কী এমন দুঃখ মাহিনের? যা জানতে চাওয়ায় চলে যায় সে? নানা প্রশ্ন উঁকি দেয় মাসনার মাঝে। মাহিনের অসহায়ত্ব আর নিষ্পাপ অবয়ব বার বার ভেসে ওঠে মাসনার হৃদয়স্পটে। মাহিনের ব্যথিত মুখটা মাসনার চিন্তার জগত ওলট-পালট করে দেয় বৈশাখী ঝড়ের ন্যায়! মাহিনের গতরের ঘ্রাণ হৃদয় ছুঁয়ে যায় তার।

উঠতি বয়স, এই বয়সে যুবক-যুবতীর যৌবনী হাওয়ার ঝড় এভাবেই উতালা করে তোলে।
মাহিনকে নিয়েই কল্পনা করতে ভালো লাগে মাসনার। মাহিনের ভাবনায় বিভোর সে। মাহিন নামটি শুনতেই ভালো লাগে তার। মাহিনের প্রশংসায় হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। মাহিনের বদনাম শুনলে রাগে-ক্ষোভে শরীর কাঁপে! কিন্তু মাহিনের জন্য এত টান কেন? এটা প্রভু-প্রদত্ত নাকি শয়তানী ধোঁকা, বুঝে ওঠতে পারে না মাসনা। ইতোমধ্যে ক্লসের টুনটুনি বেজে ওঠে।

গম্ভীর হয়ে ক্লাসে বসে থাকে মাহিন। মাসনার প্রশ্নে বিব্রত। বয়ে বেড়ানো দুঃখগুলো নতুন করে কষ্ট দেয় তাকে। মন ভালো নেই। কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যায় সে। মাসনা নিজেকে বড্ড অপরাধী ভাবে। নাহ, কাজটা ঠিক করিনি।
মাহিনকে এভাবে কষ্ট দিতে চায়নি মাসনা। তবুও ঘটে যায় এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। মাসনা ধরে নেয়– হয়ত এখানেই মাহিনের স্বপ্ন অন্তর থেকে মুছে ফেলতে হবে তাকে। কিন্তু কীভাবে সম্ভব! মাহিন ছাড়া যে একমুহূর্তও চলবে না তার! যদিও মাহিনের প্রতি মাসনার হৃদয়ের টান সম্পর্কে কিছুই জানে না মাহিন।

৫

মাহিন একা থাকতে চায়। স্রেফ একা। কিন্তু তা আর পারা গেলো কই! ছোটবোন সাবিনা এসে সব গণ্ডগোল পাকিয়ে ফেলে।

–কী রে ভাইয়া! প্রেমে-ট্রেমে পরেছিস নাকি? অমন মনমরা হয়ে কার কথা ভাবছিস? শোন! লেখাপড়া শেষ হওয়ার আগে ডুবেডুবে পানি খেলেও কাজ হবে না কিন্তু হুম! আগে লেখাপড়া, পরে তোর ইয়ে, বুঝলি?

–ঐ দাঁড়া! আজ তোর একদিন কী আমার একদিন!

এই বলে সাবিনাকে তাড়া দেয় মাহিন। সাবিনা মায়ের আঁচলে লুকায়। মাহিন দৌড়ে গিয়ে–"এই বেরিয়ে আয়! বেরিয়ে আয় বলছি" বলে চিৎকার করতে থাকে!

–কী রে কী হইছে তোদের? সারাদিন ভাই-বোনের দুষ্টুমি! আর পারি না তোদের নিয়ে; বলেন আমেনা বেগম।

–মা! মা! মাহিন ভাইয়া প্রেমে পড়েছে হা হা।

সাবিনার দুষ্টুমির জবাবে মাহিন বলে– দাঁড়া! তোর বর খোঁজতেছি! তোকে ঘর থেকে না নামালে শান্তি হবে না। মা! সাবিনার জন্য বর ঠিক করো! ওকে ঘর থেকে বের না করলে শান্তি নেই। কথাগুলো রহস্যচ্ছলে বললেও– হঠাৎ পুরো ঘর জুড়ে সুনসান নীরবতা নেমে আসে।

৬

জমির উদ্দীন কাজ শেষে বাসায় ফেরেন। সবাইকে চুপচাপ দেখে জিজ্ঞেস করেন– কী হয়েছে? সবাই চুপচাপ কেন?

–ওগো শুনছো? আমাদের সাবিনা দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেছে! ওকে বিয়ে দেবো ভাবতেই বুকটা কেমন ধড়-ফর করে ওঠে; বলেন আমেনা বেগম। আমেনা বেগমের চোখে পানি। বাবা জমির উদ্দীনও কোমরের গামছা খুলে চোখ মোছেন। সাবিনা মাকে জড়িয়ে বলে– মা! আমি তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাব না। তোমাদের ছেড়ে একমুহূর্তও থাকতে পারব না আমি।

মাহিন চোখ মুছতে মুছতে বলে– আরে পাগলী! তোর মাহিন ভাইয়া

আছে না! তোকে কোথাও হারাতে দেবো না। তোকে প্রতি সপ্তাহে দেখতে যাব আমি।

বড়ছেলে রাশেদকে নিয়ে পরামর্শে বসেন জমির উদ্দীন। সাবিনার জন্য ছেলে দেখতে হবে। একমাত্র মেয়ের জন্য যেমন বাবা-মা চিন্তিত, তেমনই একমাত্র বোনের জন্য ভাইদেরও চিন্তার শেষ নেই। যুগ-জমানার যা অবস্থা, তাতে কেমন চরিত্রের ছেলে সাবিনার ভাগ্যে আছে, তা নিয়ে পেরেশান সবাই। একমাত্র আদরের বোনটি যদি মানুষ নামের কোনো হায়েনার হাতে পড়ে যায়! তাহলে যে দুঃখের শেষ থাকবে না!

যৌতুকের আশায় কতক মানুষরূপী জানোয়ার স্ত্রীর ওপর হাত তোলে। আদরের বোন সাবিনার ভাগ্যে এমন কিছু জোটলে সহ্য করবে কীভাবে? সবাই ভাবনার জগতে হারিয়ে যায়।

দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করে সাবিনা– হে পরওয়ারদিগার! আমার জীবনে একজন দীনদার স্বামী মিলিয়ে দাও! আমি দীনদার স্বামীর ঘরণী হতে চাই। হতে চাই আদর্শ এক গৃহবধু।
নীরবতা ভেঙ্গে বড়ভাই রাশেদ বলেন– বাবা! সাবিনা যেমন নামাযী, তাতে ওর জন্য নামাযীপাত্র খোঁজ করো। নামাযীপাত্র ছাড়া এই দিনে কারও প্রতি ভরসা করা যায় না। সাবিনার মতো দীনদার বোনকে কোনো দুনিয়াদারের হাতে তুলে দিতে রাজি নই আমি। রাশেদের কথায় সহমত পোষণ করেন আমেনা বেগম।

জমির উদ্দীন বলেন– আমরা গরীব মানুষ, ভালো পরিবারের ছেলে কি আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে রাজি হবে?
–মাহিন বলে বাবা! সাবিনাকে আল্লাহ তাআলা যে রূপ দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং ওর মাঝে যে গুণ আছে তাতে যেকোনো সংসারকে আলোকিত করে রাখতে পারবে ও, ইনশাআল্লাহ।

সাবিনা স্কুলে পড়লেও প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পর থেকেই বোরকা ব্যবহার করে এবং কোনো পরপুরুষের সঙ্গে দেখা করে না। একান্ত জরুরি ও প্রয়োজন ব্যতিত কথাও বলে না। ছোটবেলা মক্তব থেকেই পবিত্র কোরআন ও প্রয়োজনীয় ইসলামের বিধি-বিধান শেখে সাবিনা।

৭

মাসনার মন খারাপ। মাহিনের জন্য চিৎকার করে কাঁদতে মন চায় তার।

ছেলে-মেয়েদের উঠতি বয়সটা এমনই হয়। কিন্তু তারা জানে না; বিবাহপূর্ব অবৈধ প্রেমাভিনয় কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে। তা ছাড়াও ইসলামী শিক্ষার অভাবেও সমাজের কথিত ভালোবাসা নামক নোংরা সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে। যে সম্পর্ক কখনও কখনও বিছানা অবদি গড়ায়। যার শেষ পরিণতি লজ্জা ও অপমান। আবার কখনও কখনও আত্মহত্যা!

মাসনা ব্যাকূল হয়ে থাকে মাহিনের ভালোবাসায়। মন মানে না। ক্লাসে বসে থাকার সামান্যতম ইচ্ছে নেই তার। একঘণ্টা একযুগের মতো মনে হয়। ইতোমধ্যে ক্লাসে ছুটির ঘণ্টা বেজে যায়। ছুটি শেষে বাসায় গিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলে না সে। চুপচাপ বসে থাকে। পরদিন আগেভাগেই ক্লাসে যায় মাসনা। মাহিনকে একনজর দেখবে বলে মনটা ছটফট করে তার। সময় বয়ে যায়– কিন্তু মাহিনের কোনো খবর নেই। সব ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত। ক্লাসের সময়ও হয়ে যায়। কিন্তু মাহিন সেদিন অনুপস্থিত।

কিছুক্ষণ পর ম্যাডাম ক্লাসে হাজির হন। ম্যাডাম ইতিহাস পড়ান। তাই তিনি ইতিহাস ম্যাডাম হিসেবে পরিচিত। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে 'ইতিহাস ম্যাডাম' নামে পরিচিতি থাকলেও সময়ের ব্যবধানে তা 'প্রেমের ম্যাডাম'-এ রূপান্তরিত হয়! কারণ ইতিহাস ম্যাডাম শিক্ষার্থীদের প্রেমের নানা কল্পকাহিনী শুনিয়ে বিনোদিত করেন! তার

ফেভারিট প্রেমের গল্প 'চণ্ডিদাস ও রজকিনী'র অমর প্রেমকাহিনী!

–রাজপুত্র চণ্ডিদাস বরশি ফেলে বসে আছেন। একে একে ১২ বছর পার হয়ে গেছে! প্রতিদিন নদীতে বরশি ফেলে বসে থাকে চণ্ডিদাস। ওদিকে নদীর ওপারে প্রতিদিন কাপড় কাঁচতে আসে ধোপার মেয়ে রজকিনী। প্রতিদিন-ই রজকিনী খেয়াল করে; নদীর ওপারে রাজপুত্র চণ্ডিদাস বরশি ফেলে বসে থাকে! রজকিনীর কৌতুহলের শেষ নেই! রাজপুত্র ১২ বছর ওপারে বরশি ফেলে বসে আছেন কেন? ১২ বছর পর রজকিনী জিজ্ঞেস করে– চণ্ডিদাস বাবু! ১২ বছর তো পার হয়ে গেলো, কোনো মাছ খোটা দিলো কী? চণ্ডিদাস জবাব দেয়; এইমাত্র একটা খোটা দিলো।

৮

তাৎক্ষণিক ঘটক তোজাম্মেল হোসেনকে ফোন করেন জমির উদ্দীন–
তোজাম্মেল সাহেব! আমি জমির উদ্দীন।
–জ্বি জ্বি! চিনতে পেরেছি। তা হঠাৎ আমাকে স্মরণ করলেন যে জমির সাহেব!
–ভাই জরুরি প্রয়োজনেই ফোন করেছি। আগামীকাল আমাদের বাড়িতে আসার সুযোগ হবে?
–অবশ্যই হবে। আগামীকাল চলে আসব ইনশাআল্লাহ; বলেন ঘটক তোজাম্মেল হোসেন।
পরদিন মাহিনদের বাড়িতে হাজির হন তিনি।
–কী খবর জমির সাহেব! আপনার শরীরটা ভালো তো! ঘরের সবাই সুস্থ আছেন?
–এই তো আছি ভাই। গরীব মানুষ যেভাবে থাকার সেভাবেই আছি। আমার একমাত্র মেয়ে সাবিনা। একজন ভালো পাত্র পেলে আল্লাহর ওপর ভরসা করে মেয়েটিকে তার হাতে তুলে দিতাম। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন জমির উদ্দীন।

মেয়ে বলে কথা। মেয়ে বড় হলে প্রত্যেক বাবা-মা'রই কপালে চিন্তায় ভাঁজ পড়ে। একদিকে বিয়ের জন্য পাত্র খোঁজা, অন্যদিকে মেয়েকে

বিদায় দিতে হবে ভেবে লোকচক্ষুর আড়ালে চোখের পানি ফেলা।

–কলিজার টুকরা মেয়েকে কীভাবে বিদায় দেবো বুঝতে পারছি না। একটিমাত্র মেয়ে আমাদের। ওকে ছাড়া থাকতেই পারি না! ঘরে ফিরে ওকে না দেখলে কীভাবে নিজেকে সামলাবো জানি না।
কথাগুলো বলতে বলতে কণ্ঠ ভারী হয়ে ওঠে জমির উদ্দীনের। দরজার ওপাশ থেকে সব শোনেন আমেনা বেগম। স্বামীর হৃদয়াগ্রাহী কথায় আমেনা বেগমও শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছেন।
–ভাবনার কিছু নেই জমির সাহেব! আপনার মেয়ের জন্য সেরা ছেলে বের করব আমি। আপনার মেয়ের কোনো প্রকার ক্ষতি করবে বা কষ্ট দেবে এমন ছেলের হাতে ওকে তুলে দেবো না ইনশাআল্লাহ; বলেন ঘটক তোজাম্মেল।

৯

প্রেমের ম্যাডাম ক্লাসে ঢুকে নির্দিষ্ট আসনে বসেন। টেবিল চাপড়ে– কী খবর তোমাদের? মন-মেজাজ ভালো সবার?
–ইয়েস ম্যাডাম।
–কারও মন খারাপ থাকলে আজ ভালো করে দেবো।
মাসনা মাথা উঠায়। ম্যাডাম মন ভালো করে দেবে! শুনি কী বলেন তিনি!
ম্যাডাম বলতে থাকেন– প্রেম মানুষের আসল ধর্ম! প্রেম ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না! তোমরা হৃদয় দিয়ে প্রেম করো, মন ফ্রেশ থাকবে। প্রেম স্বর্গ, প্রেম সুখ, প্রেমেই আনন্দ!
ম্যাডামের কথা শুনে মাসনা ভাবে– প্রেম যেহেতু মানুষের আসল ধর্ম; যেভাবেই হোক, মাহিনকে আমার প্রেমসঙ্গী বানাতেই হবে।

যুবক-যুবতীর চরিত্র নষ্টের নেপথ্যে এসব শিক্ষকরাই দায়ী। একটা ছেলে কিংবা মেয়ে যখন শোনে– 'প্রেমই আসল ধর্ম', তখন সেই ছেলে-মেয়ে নিজ ধর্ম ভুলে যায়। ভুলে যায় ধর্মীয় রীতিনীতিও। প্রেমের নামে ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়ে ব্যভিচারের দিকে। ব্যভিচারী জীবন কখনও

সুখের হয় না। অভিশপ্ত জীবন বয়ে বেড়ায় ব্যভিচারীরা। একসময় মাদক-নেশায় হারিয়ে ফেলে স্বাভাবিক জীবন। অসুস্থ মানসিকতা ঘিরে নেয় একটি সুস্থ ও সুন্দর জীবনকে। যার শেষফল অশান্তি ও যন্ত্রণা। কখনও কখনও আত্মহত্যা পর্যন্তও গড়ায়। একবার চারিত্রিক অবক্ষয়ের গ্যাড়াকলে পড়লে, সেখান থেকে বের হয়ে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

১০

মাসনা ক্লাসরুমের জানালা দিয়ে বারবার উঁকি দেয়; মাহিন আসে কী না দেখার জন্য। আজই মনের কথা জানাবে মাহিনকে। আবার ভাবে– না না! মাহিনের অবস্থা বুঝে কথা বলতে হবে। ওকে হারাতে পারবে না সে। বুঝেশুনে পদক্ষেপ নিতে হবে। অপেক্ষা করতে করতে দুপুর! কিন্তু মাহিন সেদিন আর ক্লাসে যায় না। ছুটির ঘণ্টাও বেজে যায়। সব শিক্ষার্থী চলে গেলেও মাসনা ক্লাসরুমেই বসে থাকে। বান্ধবী চৈতি লক্ষ্য করে– মাসনা মনমরা হয়ে বসে আছে।

ক্লাস থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার মাসনার কাছে ফিরে যায় সে– কী রে! তোর কী হয়েছে বল তো! দুদিন ধরে কারও সঙ্গে তেমন কথা বলছিস না, মনমরা হয়ে বসে আছিস, ছুটি হওয়ার পরও ক্লাসে বসে আছিস, কী হয়েছে বলবি! মাসনার চোখে পানি টলমলা। চৈতিকে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে।

অবৈধ প্রেম মানুষকে এমনভাবে অন্ধ করে ফেলে– ভালোমন্দ হিসেব করার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। বিবাহপূর্ব প্রেম কখনও সুখ বয়ে আনে না। প্রেমের সম্পর্ক সংসার অবধি পৌঁছায় না। প্রেমের সম্পর্ক কখনও বিয়ে পর্যন্ত গড়ালেও সাংসারিক জীবন সুখময় হওয়ার নজীর খুবই কম।

১১

–কী হয়েছে আমাকে বল! আমি যদি তোর কোনো উপকারে আসতে পারি, তাহলে নির্দিধায় বলতে পারিস। তুই আমার বেস্টফ্রেন্ড। তোর কান্না আমাকে কষ্ট দেয় বুঝিস তো!

মাসনাকে উদ্দেশ্য করে এক নাগারে কথাগুলো বলে যায় চৈতি। মাসনা চোখের পানি মুছতে মুছতে বলে– আমি হেরে যাচ্ছি চৈতি।

–মানে? কার কাছে, কিসের কারণে? আমি তো কিছুই জানলাম না!

–মাহিনকে ভালোবাসি। খুব বেশি ভালোবাসি। ওকে ছাড়া একমুহূর্তও চলবে না আমার; বলে মাসনা।

–কী বলিস! তলে তলে এতকিছু! আর এখন বিপদে পড়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদছিস! লজ্জা লাগে না! শোন! প্রেম-ভালোবাসায় এরকম মান-অভিমান না থাকলে চলে না। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। চল আমি মিটিয়ে দিই।

–না না, ওর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কোনো কথাই হয়নি। বহুদিন থেকে ওকে ভালোবেসে আসছি। কিন্তু আজও বলতে পারিনি। কাল ওর অবস্থা দেখে মনে হলো, কোনো কষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছে। আমি প্রশ্ন করতেই উঠে চলে যায়। আজ ক্লাসেও আসেনি। তাই আমি চিন্তিত। মনের কথা প্রকাশ করার আগেই যদি ওর হৃদয়ে আমার ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা চলে আসে তাহলে আমি ওর সামনে জীবনেও দাঁড়াতে পারব না।

কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে মাসনা। অট্টহাসিতে টুলের ওপর বসে পড়ে চৈতি।

–এগুলো জাস্ট পাগলামো মাসনা! আমি কী ভেবেছি আর তুই কী শুনিয়েছিস! এখন পর্যন্ত তোদের কথাই হয়নি, অথচ কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিস! তুই আগে প্রেমের ম্যাডাম থেকে ভালো করে প্রেমের সবক নে, পরে যা করার করিস।

–ইয়ার্কি করিস না চৈতি! কী করতে পারি বল!

–টেনশন বাদ দে। এখন চল বাড়ি যাই। বিকেলে তোদের বাড়িতে আসব। টেনশনমুক্ত হয়ে বাড়ি যা। গোসল করে খাওয়া-দাওয়া কর। বিকেলে কথা বলব।

এই বলে দুজন ক্লাস থেকে বেরিয়ে বাড়ি চলে যায়। চৈতির আশ্বাসে কিছুটা শান্ত হয় মাসনা।

১২

পড়ন্ত বিকেলে বাড়ির পেছনের উঠোনে কিছু একটা করছে সাবিনা। মাহিন সাবিনার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। সেই ছোট্ট সাবিনা আজ কতবড় হয়েছে।

–কী ভাবছিস ভাইয়া? জানতে চায় সাবিনা।

–তেমন কিছু না। তোকে বিদায় দিতে হবে, এটা ভাবতেই মনের ভেতরটা কেমন উথলে ওঠে।

–ভাইয়া তোদের ছেড়ে কোথাও যাব না আমি। তোদের ছেড়ে আমি থাকতে পারব না!

এ কথা বলেই কেঁদে ফেলে সাবিনা।

–যেতে তো হবেই বোন। তবে দূরে থাকতে দেবো না। আমাদের কাছেই থাকবি। আচ্ছা বল তো! তোর কেমন বর পছন্দ?

–আমি ধনী বা বেশি শিক্ষিত পাত্র চাই না ভাইয়া। গরীব হোক কিন্তু আদর্শবান ও পরিশ্রমী হলেই আমি খুশি। তবে একজন আলেমের ঘরে যেতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব; বলে সাবিনা।

–কী বলিস! আলেম কেন? হুজুরদের তেমন আয়-বাণিজ্য নেই। তারা পরনির্ভর। সমাজে তাদের মূল্যায়নও কম।

মাহিনের এমন কথায় ভীষণ কষ্ট পায় সাবিনা। মায়ের কাছে গিয়ে মায়ের কাঁধে মাথা রেখে তাঁর পাশে বসে সাবিনা। মাহিনও সাবিনার পেছনে পেছনে যায়।

–আচ্ছা মা! আলেম কি খারাপ? আমার একবান্ধবী আলেমের ঘরে খুব সুখে আছে। আলেমরা কোনোদিন বেকার থাকে না। অথচ মাহিন ভাইয়া বলে, তারা নাকি পরনির্ভর।

আমেনা বেগম কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেন– কেন রে! হঠাৎ তোরা হুজুরদের আলোচনা উঠিয়েছিস কেন?

মাহিন আগ বাড়িয়ে বলে– মা! সাবিনার নাকি আলেম বর পছন্দ!

–তাই নাকি! এ তো আনন্দের খবর! একজন আলেম ছেলের হাতে সাবিনাকে তুলে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারব। সমাজের যা অবস্থা, তাতে কাকে বিশ্বাস করব বল!

যুবসমাজ যেভাবে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে, তাতে প্রত্যেক মা-বাবাই

মেয়েদের নিয়ে চিন্তিত। তবে হুজুর ছেলেরা এসব নোংড়ামি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। হুজুর ছেলে ব্যতিত কারও ওপর বিশ্বাস নেই আমার। সাবিনা যেহেতু মুখ খুলে আলেমপাত্রের কথা বলেছে সেহেতু আলেমপাত্রের সঙ্গেই ওকে বিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। আলেম কখনও পরনির্ভরও নন, বরং না খেয়ে থাকলেও আত্মমর্যাদা নিয়ে চলাফেরা করেন তারা।

–ঠিক আছে, তোমরা যেহেতু হুজুরে বিশ্বাসী, আমারও তাতে আপত্তি নেই; বলে মাহিন।

১৩

বিকেলে প্রাইভেট পড়াতে বেরোয় মাহিন। ধীরকদমে হাঁটে আর ভাবে– এমনিতেই নানা টেনশনে সময় পার করছি, তার ওপর একমাত্র বোন সাবিনার বিয়ে-শাদীর কথা শুরু হলো। বড়ভাই রাশেদ এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না। বড়জোর নামমাত্র কিছু টাকা দিয়ে দায়িত্ব শেষ করবে। পুরো বিষয়টা নিয়ে টেনশন করতে হবে আমাকে। বাবার মাথায় টেনশন দেওয়া যাবে না। যা কিছু করার আমাকেই করতে হবে। প্রাইভেট পড়িয়ে যা পাই তা দিয়ে পানিও গরম হবে না।

এক প্রাইভেট ছাত্রের বাবার পরামর্শে দুইবছর আগথেকে প্রতিমাসে কিছু টাকা জমা করে রাখে মাহিন। যা কাউকে কখনও জানায়নি। হিসেব করে দেখে সেখানে যা জমা হয়েছে, তা দিয়ে সাবিনার বিয়েটা বেশ ভালোভাবেই হয়ে যাবে। এটা ভেবে মনে শান্তি অনুভব করে মাহিন।

মাহিন চিন্তা করে– বাবা-মা কিংবা ভাই-বোন আমাকে যেমন জানে জানুক, কিন্তু আমি তাদের প্রাপ্য আদায় করব।

হাঁটতে পথে হঠাৎ চৈতির সঙ্গে দেখা হয় মাহিনের।

–আজ যে ক্লাসে গেলেন না মাহিন ভাই? মনে হয় কোনো দুশ্চিন্তায় আছেন?

–কই না তো! পারিবারিক ব্যস্ততায় ক্লাসে যাওয়া হয়নি। আমাদের

সাবিনার বিয়ের কথা চলছে, তাই কলেজে যাইনি।
তা তুমি কোথায় যাচ্ছ?
–এই তো মাসনাদের বাড়িতে। আপনি?
–আমি প্রাইভেট পড়াতে যাচ্ছি।
চৈতি বুঝতে পারে; মাহিনের মাঝে মাসনার ভালোবাসা সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা নেই। মাসনার ভালোবাসার কথা মাহিন জানেই না। ফলে মাসনা সম্পর্কে কোনো কথা মাহিনকে বলে না চৈতি।
–দোয়া করবেন মাহিন ভাই!
–ওকে, তুমিও দোয়া করো আমার জন্য।
এই বলে মাহিন প্রাইভেট পড়াতে আর চৈতি মাসনার বাড়ির দিকে চলে যায়।

১৪

আমেনা বেগম জমির উদ্দীনের কাছে গিয়ে মুচকি হেসে বলেন– ওগো একটি খুশির খবর আছে।
–কিসের খুশির খবর?
জানতে চান জমির উদ্দীন।
–আমাদের সাবিনা বর হিসেবে আলেমপাত্র পছন্দ করেছে।
–আলহামদুলিল্লাহ! এ তো সত্যিই দারুণ খুশির খবর। নিজে আলেম হতে পারিনি। সন্তানগুলোকেও আলেম বানাতে পারিনি। জুমার আলোচনায় খতীব সাহেব যখন মনোমুগ্ধকর ইসলামী কথা বলেন, তখন হৃদয়টা প্রশান্তিতে ভরে যায়। নামাযে কত সুন্দর করে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন, মনে হয় আসমান থেকে নাযিল হচ্ছে। আফসোস হয় কেন আলেম হইনি।
প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে আমেনা বেগম বলেন– রাশেদ তো শুধু নিজের কথাই ভাবে। আর মাহিনটা আমাদের জন্য সবকিছু উজার করে দেয়। প্রাইভেট পড়িয়ে যা পায় সবটাই আমাদের হাতে দিয়ে দেয়। রাশেদ খবরও নেয় না ঠিকমতো। কিন্তু তারপরও ওর জন্যই আমাদের মন কাঁদে। কিন্তু কেন বলতে পারো?

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমেনা বেগমকে জমির উদ্দীন বলেন– আসলে ও বড় তো! হয়ত সে কারণে ওর প্রতি টান একটু বেশি। চিন্তা করো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

১৫

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষে বারান্দায় বসে চুল আঁচড়ায় মাসনা। এমন সময় চৈতি গিয়ে পৌঁছে মাসনাদের বাড়ি। চৈতিকে দেখে উঠে দাঁড়ায় সে– তুই এসেছিস! ভালোই হয়েছে। তোর অপেক্ষায়ই ছিলাম। চল ঐদিকটায় গিয়ে বসি।

এই বলে চৈতিকে নিয়ে পুকুর ঘাটে চলে যায় মাসনা। পুকুরঘাটে গল্পকরে দুজন। গল্পের মাঝেই মাসনা বলে ওঠে– মাহিনের ব্যাপারে কিছু ভেবেছিস?

–ও... আমি তো ভুলেই গিয়েছি! তোদের বাড়িতে আসার পথে মাহিন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। কিন্তু তোকে বলব তা ভুলে গিয়েছি।

নড়েচড়ে বসে মাসনা।

–মাহিন কিছু বলেছে? আমাদের সম্পর্কে তুই কিছু বলেছিস ওকে? মাহিনের ভঙ্গিমা কেমন ছিল?

একনাগাড়ে প্রশ্ন করে যায় মাসনা।

–মাহিন ভাই তোর ভালোবাসা সম্পর্কে সম্ভবত কিছুই জানেন না। তাকে স্বাভাবিকই দেখেছি।

–তাহলে প্ল্যান কর না! কীভাবে মাহিনকে আমার দিকে আকর্ষিত করা যায়!

মাসনা পীড়াপীড়ি করতে থাকে চৈতিকে। চৈতি বলে– মাহিন ভাইর মন-মেজাজ মনে হয় ভালো নেই। তার চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ দেখেছি। শুনেছি তার বোন সাবিনার বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা চলছে।

–তাহলে চল! অন্তত এই অযুহাতে আমরা ওদের বাসায় যাই! বিয়ে হয়ে যাবে তাই সাবিনাকে দেখতে এসেছি বলব।

মাসনা ও চৈতি মাহিনদের বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। এদিকে প্রাইভেট শেষ করে মাহিনও বাড়ির পথ ধরে। পথে দেখা হয়ে যায় মাসনা ও চৈতির সঙ্গে।

–কোথায় যাস তোরা?

–আপনাদের বাড়িতে যাব।

–হঠাৎ আমাদের বাড়ি!

–সাবিনাকে দেখতে যাব।

–ও আচ্ছা, ঠিক আছে তা হলে চল একসঙ্গে যাই!

তিনজন গল্প করতে করতে মাহিনদের বাড়ির দিকে চলতে থাকে।

১৬

–সাবিনার যেহেতু আলেমপাত্র পছন্দ তাহলে ঘটককে জানাতে হয়।

আমেনা বেগমকে লক্ষ্য করে বলেন জমির উদ্দীন।

আমেনা বেগম বলেন– মাহিন প্রাইভেট শেষে বাড়ি এলে ওকে দিয়ে ঘটক তোজাম্মেলকে খবর দেবো।

ইতোমধ্যে মাহিন, মাসনা ও চৈতি মাহিনদের বাড়ি পৌঁছে। মাহিনকে আমেনা বেগম ডাকেন– বাবা মাহিন! আমাদের সাবিনার যেহেতু আলেমপাত্র পছন্দ, সেহেতু আমরা আলেমপাত্রই নির্বাচন করতে চাই। তোর বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তুই ঘটক তোজাম্মেলকে খবর দে!

মাহিন ঘটক তোজাম্মেলকে খবর দেওয়ার জন্য আবার ঘর থেকে বের হয়। প্রথমে আলেমপাত্রের পক্ষে না থাকলেও সাবিনা এবং মা-বাবার চাহিদার কারণে মাহিনও মনে-প্রাণে চায়; সাবিনার জন্য একজন ভালো আলেমপাত্র মিলে যাক!

একমাত্র বোনের বিয়ে। মাহিন মাথায় নানা ধরনের পরিকল্পনা আঁটে।

১৭

ইতোমধ্যে পথে দেখা হয় মাহিনের বাল্যবন্ধু জাহিদুলের সঙ্গে। জাহিদুল আর মাহিন ছোটবেলায় একই মক্তবে পবিত্র কোরআন পড়েছে। মক্তব শেষ করে মাহিন চলে যায় স্কুলে আর জাহিদুল কওমী মাদরাসায়। জাহিদুল কওমী মাদরাসায় শরহে বেকায়া জামাতে লেখাপড়া করে। অনেকদিন পর দুইবন্ধুর দেখা হওয়ায় দুজনই আবেগাপ্লুত।

জাহিদুলকে লক্ষ্য করে মাহিন বলে– দোস্ত তোকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। চেহারার মধ্যে আলাদা একটা আর্ট আছে।

–না রে! আমার থেকে তোকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বেশি সুন্দর করে বানিয়েছেন। তবে আমি মাদরাসায় পড়ার কারণে এবং নিয়মিত নামায আদায় ও তেলাওয়াত করায় হয়তো আল্লাহ তা'আলা চেহারায় আলাদা আকর্ষণ দিয়েছেন। এটা সব নামাযী ও তেলাওয়াতকারীর মাঝেই আছে। তুইও এখন থেকে নিয়মিত নামায আদায় কর এবং পবিত্র কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত কর, দেখবি তোকেও অসাধারণ লাগবে।

আমার জানামতে তুই তো ভালো তেলাওয়াত করতে জানিস এবং তোর তেলাওয়াত শুদ্ধও। আমরা যখন মক্তবে পড়তাম, তখন সবাই তোর তেলাওয়াতের প্রশংসা করত।

জাহিদুলের কথায় মাহিন আকর্ষিত হয়।

১৮

–চল দোস্ত! আজ একসঙ্গে চা খাই; মাহিনকে অনুরোধ জানিয়ে বলে জাহিদুল।

–না রে! আমার সময় নেই। জরুরি কাজে ঘটক তোজাম্মেল সাহেবের বাড়িতে যেতে হবে।

–ঘটকের বাড়ি কেন?

–আমাদের সাবিনার বিয়ের পাত্র খোঁজা হচ্ছে তাই।

–কী বলিস! সাবিনার পাত্র খুঁজছিস! সেদিনও ওকে কত ছোট দেখেছি!

–হ্যাঁ দোস্ত! সেটাই তো ভাবছি। সেই ছোট্ট সাবিনা দেখতে দেখতে আজ কতবড় হয়ে গেছে!

–পৃথিবী এভাবেই ছোট হয়ে আসে এবং মানুষের জীবনও শেষ হয়ে যায়। আচ্ছা দোস্ত একটা কথা বল তো? তুই যেহেতু মাদরাসায় পড়িস, সেহেতু তুই বিষয়টা ভালো জানার কথা।

–হ্যাঁ বল!

–আমাদের সাবিনার ১৮ বছর হয়নি। আইনগতভাবে ওকে বিয়ে দেওয়া তো ঠিক নয়। এ ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

জাহিদুল বলে– শোন দোস্ত! রাষ্ট্রীয় আইন যদি ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী না হয় এবং মানুষের ক্ষতির কারণ না হয়, তাহলে সে আইন মানা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবশ্যপালনীয়। কিন্তু যে আইন মানুষের চরিত্র ধ্বংস করে এবং ইসলামী শরীয়তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, সে আইন প্রত্যাখ্যান করাও অবশ্যকর্তব্য।

আমাদের দেশে ১৮ বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। অথচ ১৮ বছরের আগে ছেলে-মেয়ে যদি প্রেমের নামে ব্যভিচারেও লিপ্ত হয় সেটা দোষণীয় হিসেবে দেখা হয় না! এটা দুঃখজনক!

ছেলে-মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিয়ে দেওয়া জরুরি। এতে সমাজ থেকে ব্যভিচার, ইভটিজিং, ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি কমে যাবে। সঠিক সময় ছেলে-মেয়ের বিয়ে না হওয়ায়, সমাজে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির ঘটনা দিনদিন বেড়েই চলছে। অতএব, ছেলে-মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দেওয়াটাই শরীয়ত সমর্থিত কাজ।

সঠিক সময় বিয়ে না হওয়ায় একদিকে যেমন পরকীয়া বাড়ে অন্যদিকে যৌনহয়রানি ও ধর্ষণও বাড়ে। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় আইনে প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছর) হওয়ার আগে, ছেলে-মেয়ের প্রেম-ভালোবাসা নামে যেই সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাতে কল্পনাতীত সামাজিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটে।

এসব অবৈধ সম্পর্কের কারণে যুব-সমাজের চরিত্র দিনদিন ধ্বংস হচ্ছে। কখনও কখনও দেখা যায়, এসব সম্পর্ক ছিন্ন হলে ছেলে কিংবা মেয়ে অথবা উভয়ে আত্মহত্যা করে ফেলে! অনেক সময় দেখা যায়

যুবক-যুবতী মাদক নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে! এসব নাপাক সম্পর্ক নাকি মাদক সেবক ছাড়া জমেই না! এই সম্পর্কের অন্যতম একটা অংশ নাকি ধুমপান আর মাদক! এটা অস্বীকার করার সুযোগ নেই- বিবাহপূর্ব এই সম্পর্কের কারণে অনেকের মাঝে শত্রুতা তৈরি হয়ে একে অপরকে খুন পর্যন্ত করে ফেলে! এমন বহু নজির রয়েছে আমাদের মাঝে।

১৯

ছেলে-মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে মা-বাবার দায়িত্বে যদি বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে ঐ সংসারগুলো বেশিরভাগই সুখের হয় এবং মা-বাবার পছন্দ অনুযায়ী পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করতে পারেন। পক্ষান্তরে বিবাহপূর্ব সম্পর্কের কারণে অযোগ্য ছেলে কিংবা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠায় এসব সম্পর্ক কোনো মা-বাবা মেনে নিতে চান না। মেনে নেওয়ার কথাও নয়। ফলে পারিবারিক কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হয়। সংসারে নেমে আসে রাজ্যের অশান্তি। সামাজিকভাবে মুখ দেখাতে পারেন না মা-বাবা।

এই যে একটা নীতি ১৮ বছরের আগে কোনো মেয়েকে বিয়ে দেওয়া যাবে না; উপরোক্ত সব অন্যায়ের জন্য এই নীতিই দায়ী। এর দায়ভার এই আইনের প্রবক্তারা এড়াতে পারবেন না। এজন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নীতি-আদর্শ মেনে চললে ব্যক্তিজীবন, সাংসারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি নেমে আসবে অবশ্যই। পৌঁছুতে পারবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

–এত সুন্দর করে বুঝিয়েছিস, আগে এভাবে বুঝায়নি কেউ; বলে মাহিন।

–তুইও যদি মাদরাসায় লেখাপড়া করতি, তাহলে আমার থেকে আরও ভালোভাবে বুঝাতে পারতি। এটা আমার বিশ্বাস।

–দোস্ত তুই যে ব্যাখ্যা দিয়েছিস তাতে অনেকে তো তোকে নারীবিদ্বেষী

বলবে! মনে করবে তুই নারীদের অল্পবয়সে বিয়ে দিয়ে তাদের জীবন ধ্বংস করতে চাস!
–শোন! এটা মানসিকতার ব্যাপার। যার মানসিকতা যেমন, সে সেভাবেই ভাববে। আমি দেশ, সমাজ, সংসার ও নারীর সম্মান বাঁচাবার কথা বলেছি। ধর্ষণ, যৌন হয়রানী ও পরকীয়ারোধের কথা বলেছি। নারীর ইজ্জত-আব্রু ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার কথা বলেছি। এখন কেউ যদি আমার এ ভালো কথাগুলোকে খারাপের দিকে নিয়ে ব্যাখ্যা করে, সে ক্ষেত্রে আমার কী করার আছে?

এবার মাহিন বুঝতে পারে আলেমপাত্র সত্যিকারেই অসাধারণ হবে। জাহিদুল আলেম লাইনে পড়ালেখা করছে। কী সুন্দর ও স্বচ্ছ চিন্তাভাবনা নিয়ে চলে! আলেম ছাড়া এমন নির্মল ভাবনা কেউ কল্পনাও করে না। সাবিনাকে আলেমের হাতে তুলে দিতে পারলে সত্যিই ও খুব সুখী হবে। মনে মনে সাবিনাকে ধন্যবাদ জানায় মাহিন। তুই ঠিক কাজটাই করেছিস বোন! মনের অজান্তেই আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার চোখ থেকে।

২০

আমাদের সাবিনা আলেমপাত্র পছন্দ করেছে। মা-বাবাও একমত। আমি প্রথমে একমত না হলেও পরে সাবিনা ও মা-বাবার পছন্দের দিকে তাকিয়ে একমত হয়েছি। তবে তোর কথা শোনার পর আমি শুধু একমতই নই, বরং আলেম পাত্রের জন্য যা করা দরকার আমি তা করব।
জাহিদুল বলে– সবাই যেহেতু আলেমপাত্রের ক্ষেত্রে একমত, তাহলে ঘটকের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার জানামতে ভালো, নম্র ও ভদ্র একজন আলেমপাত্র আছেন। দেখতেও মানানসই আলহামদুলিল্লাহ। সাবিনার সঙ্গে বেশ মানাবে। ঘটকরা দুনিয়াবী লাইনের ভালো পাত্রের খোঁজ দিতে পারলেও, ভালো আলেমপাত্রের খোঁজ দিতে পারবে বলে মনে হয় না।

–তাহলে তো ভালোই হয়! তোর সন্ধানে ভালো পাত্র থাকলে ঘটকের কাছে যাব না। তোর সেই পাত্রই আমাদের দেখা!
জাহিদুল জানায়– আর্থিকভাবে পাত্র দুর্বল। তবে ছেলে কর্মঠ এবং ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলা যায়। ভবিষ্যতে কিছু একটা করে নিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। তাঁর মাঝে সে স্পৃহা আছে। তোরা রাজি থাকলে আমি সামনে এগোবো।
–ঠিক আছে দোস্ত! আমি বাড়িতে গিয়ে বাবা-মা'র সঙ্গে আলাপ করে তোকে জানাব।

২১

মাহিনদের বাড়ি পৌঁছে মাসনা ও চৈতি সরাসরি সাবিনার ঘরে চলে যায়। খুনসুটিতে মেতে ওঠে সাবিনাকে নিয়ে। তুই আমাদের ছোট হয়ে আগেই স্বামীর ঘরে চলে যাবি এটা কেমন কথা? না না তোকে স্বামীর ঘরে যেতে দেওয়া হবে না! এরকম নানা ধরনের হাসি রসাত্মক কথায় সাবিনাকে ক্ষেপিয়ে তোলে দুজন।
কিন্তু যতই হাস্যরসমূলক কথা বলুক না কেন, মাসনার মনে চিন্তা একটাই– কীভাবে মাহিনকে তার ভালোবাসায় আবদ্ধ করা যায়। একবার ভাবে সরাসরি মাহিনকে বলবে। আবার চিন্তা করে, এই মুহূর্তে মাহিনকে কিছুই বলা যাবে না। আবার ভাবে– সাবিনাকে জানাবে। না না কী ভাবছি! বড়ভাইর ভালোবাসার ব্যাপারে ছোটবোনকে কীভাবে বলি! সবকিছু মিলিয়ে বড়ধরনের প্রেসার অনুভব করে মাসনা।
চৈতিকে বলে– এলাম মাহিনকে নিয়ে পরিকল্পনা করব বলে, কিন্তু মাহিন তো ঘরেই নেই! এসে আবার ঘটকের বাড়ি চলে গেছে। কী করা যায়?
চৈতি বলে– চল সাবিনার সঙ্গে কিছু কথা বলি! সাবিনা বলতে পারবে মাহিনের মাঝে তোর প্রতি ভালোবাসার কোনো আভাস পেয়েছে কী না। কারণ সাবিনা আর মাহিন একে অপরকে সবকিছু শেয়ার করে এবং ওরা দুজন বন্ধুর মতোই চলে।

২২
মাহিন বাড়ির দিকে চলে যায়। ওদিকে মা-বাবা মাহিনের অপেক্ষায় বসে আছেন। মাহিন বাড়ি ঢোকতেই আমেনা বেগম বসা থেকে উঠে দাঁড়ান– কী রে মাহিন! খবর কী? ঘটকের দেখা পেয়েছিস?
–ঘটকের বাড়ি যাইনি।
–সে কী! ঘটকের বাড়ি যাসনি মানে? তো কোথায় গিয়েছিলে? তোকে তো ঘটকের কাছেই পাঠিয়েছিলাম।
–এত তাড়াহুড়া করছ কেন! একটু শান্ত হয়ে বসো! বিস্তারিত বলছি! শোনো মা! ঘটকের কাছে না গেলেও তার চেয়ে ভালো ব্যবস্থা করে এসেছি।
–কী বলিস! তাড়াতাড়ি বল বাবা! কী সে ব্যবস্থা?
জানতে চান বাবা জমির উদ্দীনও।

মাহিন বলতে শুরু করে– মক্তবের বন্ধু জাহিদুলের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। বাবা তুমি তো জাহিদুলকে চেনার কথা! ঐ যে আমাদের পাশের গ্রামের রহমান চাচার ছেলে! আমরা একই সঙ্গে মক্তবে পড়েছি, খেলাধুলা করেছি, মাছ ধরেছি, মক্তব শেষ করে আমি চলে যাই স্কুলে আর জাহিদুল চলে যায় মাদরাসায়। আজ ও অনেক সুন্দর করে কথা বলেছে। ওর কথা শুনে মনে হয়েছে তোমরা সাবিনার জন্য আলেমপাত্র নির্বাচন করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ, তা ঠিকই করেছ।
জাহিদুল আমাকে একজন আলেমপাত্রের সন্ধান দিয়েছে। আমি ওকে বলেছি, তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে জানাব।
জমির উদ্দীন বলেন– ছেলের বংশ ও আচার-ব্যবহার কেমন সেগুলো তো আগে জানতে হবে নাকি? আমরা গরিব হলেও আমাদের বংশমর্যাদা রয়েছে। সমাজে মানুষ আমাদের সম্মানের চোখে দেখে। ছেলেকেও অন্তত আত্মমর্যাদাশীল হতে হবে।
–বাবা! জাহিদুল যা বলেছে, তাতে মনে হয়েছে ছেলেপক্ষ ভালোই হবে। তোমরা বললে জাহিদুলকে ব্যবস্থা করতে বলতে পারি।
ছেলে এবং ছেলের বাড়ির পরিবেশ পছন্দ হলে আমরা ওদেরকে আমাদের বাড়িতে ডাকব মেয়ে দেখার জন্য।
জমির উদ্দীন বলেন– ঠিক আছে, তাহলে তুই জাহিদুলকে জানা, আমরা ছেলে দেখতে যাব।

২৩

সাবিনাকে ডেকে পেছনের উঠোনে নিয়ে যায় মাসনা ও চৈতি– মাহিনের মাঝে কারও প্রতি দুর্বলতার কোনো নিদর্শন পেয়েছ? সাবিনাকে সরাসরি প্রশ্ন করে চৈতি।

সাবিনা অবাক কণ্ঠে জানতে চায়– হঠাৎ এমন প্রশ্ন? কিছু হয়েছে কী?

–না তেমন কিছু হয়নি, এমনিই জানতে চেয়েছি; বলে চৈতি।

সাবিনা জানায়– এমন কিছু এখনও দেখিনি। তবে হ্যাঁ, পরশুদিন মাহিন ভাইয়াকে খুব আপসেট দেখেছি। ক্লাস থেকে আগেই চলে আসে। কী কারণে আপসেট ছিল জানতে পারিনি। ও নিজেও বলেনি আমাকে। বরং আপসেট দেখে ওকে ক্ষেপানোর জন্য কারও প্রেমে পড়েছে কী না জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাতে ও আমার ওপর রেগে যায়। এর থেকে বেশি কিছু জানি না।

আচ্ছা কী হয়েছে আমাকে বলবে?

–আমি মাহিনকে ভালোবাসি। পাগলের মতো ভালোবাসি। মাহিনকে ছাড়া বাঁচব না। মাহিন যদি আমার ভালোবাসা ফিরিয়ে দেয়, তাহলে আত্মহত্যা ছাড়া আমার অন্য কোনো গতি থাকবে না!

মাসনার মুখে এমন কথা শুনে হতবাক সাবিনা। বলে– তা আমি কী করতে পারি? আমি কি মাহিন ভাইয়ার সঙ্গে আলাপ করব? তবে একবার না করলে ওকে হ্যাঁ বলানো কঠিন!

চৈতি বলে– তুই পারবি। মাসনা দুই-তিনদিন ধরে খুব বেশি টেনশন করছে। ও তো দেখতেও অনিন্দ্য সুন্দরী! কী? ভাবী হিসেবে তোর পছন্দ নয়!

–মাসনা আপু তো আমার আগে থেকেই পছন্দের প্রথম তালিকায়। তবে ভাবী হিসেবে ভাবিনি কখনও। এখন তো ভাবী ভাবতেই ভালো লাগছে! আচ্ছা দেখি ভাইয়াকে কোনোভাবে বুঝানো যায় কী না।

দায়িত্বটা আমিই নিয়ে নিলাম। কী ভাবী? আমার ওপর আস্থা আছে তো!

মাসনাকে ভাবী সম্বোধন করে হাসিচ্ছলে বলে সাবিনা।

লজ্জায় মাথা নুইয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে মাসনা বলে– আমি তোমার স্থায়ী ভাবী হতে চাই। তুমি আমাকে ভাবী বলায় অন্তরে বেশ শান্তি অনুভব করেছি। আমি এই ঘরের বউ হয়ে আসতে চাই। আমি তোমার

মা-বাবার খেদমত করতে চাই। তাদের বৌমা হয়ে মাহিনকে আগলে রাখতে চাই আমার জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত। তুমি সহযোগিতা করলে আমার স্বপ্ন পূরণ হবে।

২৪

সাবিনার সঙ্গে কথা শেষে মাসনা ও চৈতি মাহিনের মায়ের কাছে বিদায় নিতে যায়– চাচি তাহলে আজকের মতো বিদায় নিই। দোয়া করবেন আমাদের জন্য। আর সাবিনার জন্য শুভকামনা রইল।

এই বলে আমেনা বেগমের কাছে বিদায় চায় তারা। মাহিন তাদের লক্ষ্য করে বলে– তোরা এলি কিন্তু তোদেরকে সময় দিতে পারলাম না। মনে কষ্ট নিস না। আবার আসিস। সাবিনার বিয়েতে কিন্তু অবশ্যই থাকতে হবে তোদের। তোদেরকে আমি স্পেশাল দাওয়াত দেবো।

মাহিনের দাওয়াতে পুলকিত মাসনা।

মাসনা বের হয়ে যায় আর ঘাড় ঘুরিয়ে মাহিনকে আরেকবার দেখে নেয়। মাসনার দিকে তাকিয়ে স্বভাবসুলভ মুচকি হাসে মাহিন। মাহিনের হাসিতে মুগ্ধ মাসনা। মাসনার কাছে মনে হয়- মাহিনের হাসিতে সারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে ওঠে। মাহিনের খুশিতে মাসনারও খুশি লাগে। মাহিনের আনন্দে আনন্দ পায় সে। কষ্ট পায় মাহিনের কষ্টে। মুহূর্তের জন্য কল্পনায় অন্য জগতে হারিয়ে যায় মাসনা।

চৈতির ডাকে সম্বিত ফিরে পায়– চল, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে! আমি বাড়ি চললাম। তুই সন্ধ্যার আগে আগেই বাড়ি যা। রাস্তাঘাটের যা অবস্থা! আজকাল মেয়েরা তো রাস্তায় বের হতেই পারে না! বখাটেরা সবসময় ওঁৎ পেতে থাকে। মেয়েদের চলাচলের নিরাপদ পরিবেশ নেই বললেই চলে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাজার-ঘাট, এমনকি বাড়ির উঠান পর্যন্তও নিরাপদ নয়! তিনবছরের শিশু থেকে আশি বছরের বুড়ি, কেউ নিরাপদ নয় এই দেশে।

ওলামায়ে কেরাম যে বলেন, নিরাপদ পরিবেশ না পেলে মেয়েদের স্কুলে

না পড়াতে, তা ঠিকই বলেন। তাঁরা নারীর সম্মান ও মর্যাদার কথা চিন্তা করেই বলেন। নারী অধিকারের শ্লোগানধারী যত গলাবাজ আছে, ওগুলো সব ধান্ধাবাজ! নারীদের পণ্য আর ভোগের সামগ্রিতে পরিণত করার ফন্দি।

বর্তমান যে শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে- তাতে কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবে না, এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে যুবক-যুবতী বা শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন হয়। মাঝে মাঝেই মিডিয়ায় দেখা যায়, স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরা মাদক নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে! ৬-৭ বছরের বাচ্চারা পর্যন্ত আড়ালে আবডালে লুকিয়ে ধূমপান করে!

২৫

আনুকূল্য পরিবেশ না থাকায় যৌন হয়রানির শিকার হয় মেয়েরা। এমনকি শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী এবং ছাত্র কর্তৃক শিক্ষিকা ধর্ষিত হওয়ার ঘটনাও কম নয়! এসবের বড় স্বাক্ষী মিডিয়া! পরিবেশ এতটাই ঘোলাটে যে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার এমন করুণ দশা হয়ে দাঁড়িয়েছে, চরিত্র গঠন তো দূরের কথা- এমনকি শিক্ষাটাও ঠিকঠাকভাবে হয় না! পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়!

একটি টিভি রিপোর্টে দেখা গেছে, একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা দিবসে কলেজ-ভার্সিটির ছাত্ররা একুশ ফেব্রুয়ারি কী দিবস তা বলতে পারেনি! এমনকি বিজয় দিবস বা স্বাধীনতা দিবসকেও গুলিয়ে ফেলে! জিপিএ-ফাইভ পাওয়া শিক্ষার্থীরা জিপিএ-ফাইভের পূর্ণরূপ জানে না!

মেয়েদের শিক্ষার পরিবেশ না হলে স্কুল, মাদরাসা কিংবা শপিংয়ে পাঠানো রিস্কের ব্যাপার। নারী যাতে ইজ্জত নিয়ে চলতে পারেন, সম্মান না হারান, ইভটিজিং ও যৌন হয়রানির শিকার না হন, সেজন্য নারীদের নিরাপদ পরিবেশ দরকার।

নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে। আরও এগিয়ে যাওয়া দরকার। বেশি বেশি ডিগ্রি অর্জন করে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা দরকার। বিভিন্ন সেক্টরে নারীদের অবদান থাকা জরুরি। কিন্তু সেটা তাদের ইজ্জত-সম্মান

বিকিয়ে নয়। সেজন্য প্রয়োজন যথাযোগ্য পরিবেশ। নারীরা সব পরিবেশে কাজ করতে পারেন না। তাদের জন্য এটা শোভাও পায় না।

এজন্য সবার এই কথার ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিৎ- লেখাপড়ার পরিবেশ না থাকলে আপনার মেয়েকে স্কুলে পাঠাবেন না। পরিবেশ অনুকূলে না থাকলে আপনার মেয়েকে বখাটের হাতে হয়রানীর শিকার হতে হবে। অতএব, সবাই মিলে শিক্ষার যথাযথ পরিবেশের পক্ষে আওয়াজ তুলুন এবং এর পক্ষে জনমত গড়ে তুলুন!

কওমী মহিলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো জেনারেল শিক্ষার ক্ষেত্রেও নিরাপদ পরিবেশ চাই। কেননা, কওমী মহিলা মাদরাসার ছাত্রীরা যৌন হয়রানি থেকে শুরু করে কোনোধরণের বৈষম্যের শিকার হয় না। যে শিক্ষাই হোক না কেন- মেয়েদের শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ চাই।

২৬

ইসলাম ও নবীজির আদর্শ সবসময় নারীর সম্মান অধিকার ও মর্যাদাকে প্রাধান্য দিয়েছে। পৃথিবীর রচিত এমন কোনো আদর্শ নেই- যে আদর্শ নারীর জন্য ইসলামী আদর্শের থেকে কল্যাণকামী। বরং ঐসব রচিত আদর্শে নারী উন্নতির নামে নারীদের পণ্য বানাবার চেষ্টাটাই বেশি করা হয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ এবং নীতি নারীকে মুক্তি দিয়েছে। সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছে।

অন্ধকার সেই জাহেলী যুগে নারীদেরকে যখন সস্তা পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতো, কন্যা সন্তান হলে জীবন্ত দাফন করা হতো, সেই বর্বর যুগ দূর হয়েছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমন ও তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। নবীজির আদর্শের মাধ্যমেই নারীরা প্রথম তাদের অধিকার ফিরে পান এবং জানতে পারেন, সমাজে তাদেরও একটা অবস্থান ও মর্যাদা আছে।

ওলামায়ে কেরাম ইসলামের সেই সুমহান আদর্শ বুকে ধারণ করে- দিনের পর দিন ছুটে বেড়ান দ্বারে দ্বারে। কথা বলেন নারীদের সম্মান নিয়ে। নারীর ইজ্জত-অধিকার নিয়ে ওলামায়ে কেরাম থেকে কেউ বেশি

বলে না। ওলামায়ে কেরাম কর্তৃক কোনো নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয় না।

দাবি তোলা উচিৎ-
'নারীর শিক্ষার যথাযথ পরিবেশ চাই, নাহয় পরিবেশহীন শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের মেয়েদের পাঠাব না।'

২৭

মাহিন একগ্লাস পানি পান করে সন্ধ্যার পর আবার চলে যায় জাহিদুলদের বাড়িতে। জাহিদুল বাড়ির সামনে কাচারি ঘরে মাগরিবের নামায আদায় শেষে কোরআন তেলাওয়াত করছিল। সে কী মধুর তেলাওয়াত! মাহিন পেছনে দাঁড়িয়ে রয়। তন্ময় হয়ে শোনে পবিত্র কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত। জাহিদুল তেলাওয়াত শেষে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখে মাহিন দাঁড়িয়ে আছে!

–আরে দোস্ত তুই? বিকেলেই না তোর সঙ্গে কথা হলো! হঠাৎ আবার?

–একমাত্র বোনের বিয়ে বলে কথা। বাবা-মা খুব টেনশন করছেন। আমি বাবা-মা'র সঙ্গে আলাপ করেছি। তারা ছেলে দেখার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ছেলেপক্ষের সঙ্গে কথা বল তুই। তারা তাদের মতো করে আমাদের সামাজিক ও বংশীয় মর্যাদা জেনে আমাদের যেতে বললে, তবে আমরা ছেলে দেখতে যাব।

–ওকে! ঠিক আছে, আমি বরপক্ষের সঙ্গে আলাপ করে তোকে জানাব। যত দ্রুত ব্যবস্থা করা যায় আমি চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

এর মাঝে জাহিদুলের মা চা-নাস্তা পাঠান মাহিনের জন্য। চা খেতে খেতে গল্পে মজে ওঠে দুজন।

–আচ্ছা দোস্ত তোর কী অবস্থা বল, বিকেলের সাক্ষাতে তেমন কোনো খবরই নিতে পারিনি। লেখাপড়া কেমন চলছে? গল্পের ফাঁকে মাহিনের কাছে জানতে চায় জাহিদুল।

মাহিন বলে– এই চলছে কোনোমতে। মানসিকভাবে কষ্টের মধ্যে থাকি রে দোস্ত! বলার মতোও কেউ নেই। সেই অষ্টম শ্রেণি থেকে প্রাইভেট পড়াই। তুই তো জানিস বাবা দিনমজুরী কাজ করেন।

২৮

বড়ভাই রাশেদ নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝেন না। বিয়ে করে আলাদা থাকেন। বাড়ির খোঁজ-খবর নেন না। আমি প্রাইভেটের বেতন দিয়ে লেখাপড়ার খরচ ও সাবিনার লেখাপড়া করাই। প্রাইভেটের বাকি যে টাকাটা থাকে, তাও বাবা-মা'র কাছে তুলে দিই। আমার একছাত্রের অভিভাবকের পরামর্শে প্রতিমাসে কিছু কিছু টাকা জমিয়ে রাখি। জমানো সেই টাকাগুলো সাবিনার বিয়েতে খরচ করব। তারপরও মা-বাবা, ভাই-বোনের কাছে ততটা আগ্রহের পাত্র হতে পারিনি, যতটা বড়ভাই!

বিভিন্ন সময় আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। মানসিকভাবে খুব কষ্ট পাই রে দোস্ত!

ছোট্ট জীবনের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে কেঁদেই ফেলে মাহিন।

জাহিদুল সান্ত্বনা দিয়ে বলে– এতে কান্নার কী আছে দোস্ত! এটাই তো দুনিয়ার নিয়ম! তবে তুই সব জায়গায় সম্মান পাবি মনে রাখিস। তোর ভাই-বোন, বাবা-মা তোর সঙ্গে কী আচরণ করেন সেটা দেখার বিষয় নয়, বাবা-মা, ভাই-বোনের সঙ্গে তুই কী আচরণ করিস সেটাই দেখার বিষয়।

একটা কথা স্মরণ রাখবি, যত যাই হোক তারা তোর মা-বাবা।

মহিন বলে– দুঃখ একটাই দোস্ত, এতকিছুর পরও বড়ভাইর সামনে আমাকে সবসময় অপমান করে। অথচ কিছু প্রয়োজন হলে আবার আমাকেই মেটাতে হয়! আমার অগোচরে বাবা-মা, ভাই-বোন এক জায়গায় হলে আমার দোষগুলো চর্চা করে। নিজের কাছে নিজেকে খুব ছোট লাগে! আমাকে তারা খুব ঘৃণা করেন সেটাও আমি জানি। দোয়া করিস আল্লাহ যেন আমার ধৈর্য আরও বাড়িয়ে দেন।

–ঠিক আছে দোস্ত টেনশন করিস না! আমি দোয়া করি তোর জন্য। রাতে খেয়ে গেলে খুব খুশি হতাম!

–না দোস্ত! বাড়িতে মা-বাবা টেনশন করবেন। কাল কলেজ আছে। আজ গেলাম। তুই আমাকে দ্রুত খবরটা জানাস কিন্তু! ওকে, আল্লাহ হাফেজ!

–ওকে, চলি! আগামীকাল দেখা হচ্ছে; এই বলে চলে যায় মাসনা।
পড়ার টেবিলে মন বসে না মাসনার। বই খোললেই মাহিনের ছবি ভেসে ওঠে হৃদয়স্পটে। মাহিনের কথা ভাবতে ভাবতেই রাত গভীর হয় তার।

বিবাহপূর্ব এসব অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক মানুষের স্বাভাবিক কাজের গতি মন্থর করে দেয়। লেখাপড়া নষ্ট হয়। স্বাভাবিক জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটে এবং চরিত্র নষ্টের কারণও। যদিও হাল জমানার প্রেমিক-প্রেমিকারা এগুলো মানতে নারাজ।
সারাদেশে বিবাহপূর্ব প্রেমের সম্পর্কের কারণে কত যুবতী ধর্ষণের শিকার হয়েছে, হত্যা হয়েছে, প্রেমিক কর্তৃক প্রতারিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে, সাংসারিক ও পারিবারিক সম্পর্কের ছিন্নতা ঘটেছে, এসব জানার পরও যুবক-যুবতী কিংবা শিক্ষার্থীরা এ ধ্বংসাত্মক পথ থেকে ফিরে আসছে না। বরং দিনদিন এ সম্পর্ক মহামারী আকার ধারণ করছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষার অভাব ও নীতি-নৈতিকতাহীন পরিবেশ এবং ছেলে-মেয়ের অবাধ ওঠা-বসা।
এ থেকে উত্তরণের জন্য অভিভাবকদের এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। নাহয় দিনদিন যুবসমাজের চরিত্রের অবক্ষয় হতেই থাকবে।
প্রেমের নামে যৌনতা ছড়িয়ে পড়ছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ডেটিং-এর নামে পার্কে বাগানে চলে ওপেন যৌনাচার! অভিভাবকরা সচেতন না হলে এর খেসারত গুনতে হবে কড়ায়-গণ্ডায়।

৩০

রাত হয়েছে খেতে আয় মা! মাসনাকে ডাকেন মাসনার মা।

খাওয়া-দাওয়া শেষে ঘুমের বিছানায় গেলেও এপিঠ-ওপিঠ করে রাত কাটিয়ে দেয় মাসনা। মাহিনের চিন্তায় ঘুম হয় না। সকালে প্রস্তুতি নিয়ে আগেভাগেই ক্লাসে চলে যায় সে। তখনও কোনো ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত

হয়নি। পড়ার টেবিলে বই রেখে মাসনা একা বসে আছে। মাহিনের প্রেমে বিভোর মাসনা। ক্লাসে বসেই মাহিনের নিকট একটা চিঠি লেখে–

'প্রিয় মাহিন। জানি না কোনোদিন তোমার ভালোবাসা পাব কী না। বহুদিন থেকে তোমার ভালোবাসা পাব বলে পথ চেয়ে বসে আছি। তুমি কি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বোঝো না? তোমার প্রেমে আমি হাবুডুবু খাই।
আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়টাকে নতুন করে সাজাতে চাই আমার ভালোবাসা দিয়ে। তুমি যদি আমার ভালোবাসা গ্রহণ না করো, তাহলে আমার জীবন বৃথা হয়ে যাবে। আর সে বৃথা জীবন আমি পৃথিবীতে রাখব না। তোমাকে না পেলে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব। পাত্রী হিসেবে আমি তোমার অযোগ্য নই এটাই মনে করি। আমার হৃদয় থেকে তোমার নাম কোনদিনও মুছতে পারব না। আশা করি আমাকে তুমি ফিরিয়ে দেবে না। আমি তোমার ভালোবাসার কাঙাল। আমার জীবনে যদি কোনো পুরুষ জড়াতে চাই, সেটা একমাত্র তুমি। তুমিই শুরু এবং তুমিই শেষ। তোমাকে ছাড়া মাসনা অন্য কোনো পুরুষের হাত ধরবে না।
ইতি- তোমার ভালবাসার কাঙাল মাসনা'

চিঠি লেখা শেষে ক্লাসরুমে বসে থাকে মাসনা। এক এক করে ক্লাসের সবাই চলে আসে। চলে আসে মাহিনও। মাসনা শিহরিত। ক্লাসের পর প্রেম নিবেদনমূলক চিঠি দেবে মাহিনকে। যথারীতি ক্লাস শেষে মাসনা আগে আগে ক্লাস থেকে বের হয়ে রাস্তায় চৈতির অপেক্ষা করে। মাহিনও ক্লাস থেকে বের হয়। চৈতি বেরিয়ে সোজা মাহিনের পাশে চলে যায়– আপনার সঙ্গে কথা আছে মাহিন ভাই!
–কী কথা বল! আমার আবার তাড়া আছে।

–আপনাকে কলেজের একটি মেয়ে প্রচণ্ডরকম ভালোবাসে। মেয়েটি খুবই ভালো। এক নিশ্বাসে কথাগুলো শেষ করে চৈতি ভোঁ দৌড়!
–এই নামটা বলে যা! হাঁক ছেড়ে বলে মাহিন।
চৈতি দৌড়াতে দৌড়াতে বলে– আপনি খুঁজে নিয়েন!

চৈতির কথা শুনে মাহিন কী যেন ভাবতে শুরু করে। আমি গরিবের ছেলে, আমাকে ভালোবাসার এমন কে আছে?

৩১

চৈতি মাসনাকে বলে– কাজ সেরে ফেলেছি, এবার চল!

–কী সেরেছিস?

–মাহিন ভাইকে তোর ভালোবাসার কথা বলে দিয়েছি।

–সত্যি? কী বলল মাহিন?

চৈতির কাছে জানতে চায় মাসনা।

–এই রে! আমি লজ্জায় তার উত্তর না শুনেই দৌড়ে চলে এসেছি। তোর নামটাও বলতে ভুলে গেছি।

–এটা কোনো কাজ করলি?

–আচ্ছা তুই আমার জন্য আরেকটু কষ্ট কর!

–কী বল!

–আমি মাহিনের জন্য চিঠি লিখেছি। ওর কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

–কী লিখেছিস দেখি!

পুরো চিঠি পড়ে 'মন্দ হয়নি' বলে চিঠি নিয়ে আবার মাহিনের কাছে চলে যায় চৈতি। মাহিনের হাতে চিঠি ধরিয়ে দিয়ে বলে– মাহিন ভাই আল্লাহ আপনাকে ভালো রাখুন, চিঠিটা মনোযোগসহকারে পড়বেন!

মাহিন ক্ষণিকের জন্য ভাবে– তাহলে চৈতি কি আমাকে ভালোবাসে! না না! চৈতির মাঝে তো এমন কোনো নিদর্শন দেখতে পাইনি! চৈতি তো আমাকে সবসময় বড়ভাইয়ের মতোই দেখে, আর আমিও ওকে ছোটবোনের মতোই দেখি। তাহলে...!

মাহিন চিঠিটা বইয়ের মধ্যে রেখে সোজা বাড়ি চলে যায়। ব্যাগ রেখে গোসল সেরে দুপুরের খাবারের দস্তরখানে বসে মাহিন।

৩২

বিকেলে পজিটিভ সংবাদ নিয়ে মাহিনদের বাড়ি হাজির হয় জাহিদুল। মাহিনের বাবা জমির উদ্দীন দুপুরের খাবার খেয়ে উঠানে পায়চারি করেন। জাহিদুলকে দেখে বলেন– বাবা তোমাকে চেনা চেনা লাগছে।

–চাচা আমি পাশের গ্রামের ছেলে। আমার বাবার নাম আবদুর রহমান। আপনার ছেলে মাহিন আমার বন্ধু। আমরা ছোটবেলা একসঙ্গে মক্তবে পড়েছি। আমি এখন একটি মাদরাসায় পড়ি। গতকাল মাহিনের সঙ্গে সাবিনার বিয়ের পাত্র নিয়ে কথা হয়েছে।

–ও হ্যাঁ, হ্যাঁ! তুমি তাহলে রহমানের ছেলে? মাশাআল্লাহ! অনেক বড় হয়েছ তুমি। দেখতেও বেশ সুন্দর লাগছে তোমাকে। তা বলো কী সংবাদ?

–আপনারা চাইলে পাত্র দেখতে যেতে পারেন। পাত্রপক্ষ প্রস্তুত রয়েছে।

–আমাদের পারিবারিক বা সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে তারা জানে?

–হ্যাঁ চাচা, তারা ইতোমধ্যেই আপনাদের খবর নিয়েছেন এবং খবর নিয়েই তারা রাজি হয়েছেন। আপনারা চাইলে পাত্র দেখতে যেতে পারেন।

–এ তো খুশির সংবাদ বাবা!

আমেনা বেগম সামনের রুমে এসে জাহিদুল ও স্বামী জমির উদ্দীনের কথোপকথন শুনেই বুঝতে পারেন- মাহিন যে ছেলেটির কথা বলেছে, এ সেই ছেলেই।

তিনি বলেন– সে কী! তোমরা দাঁড়িয়ে কথা বলছ কেন? ঘরে বসে কথা বলো! মেহমান দাঁড় করিয়ে রাখে কেউ?

–দেখেছ কী কাণ্ড? আমি তো ভুলেই গিয়েছি! চলো বাবা ঘরে বসে কথা বলি।

৩৩
খাবারের দস্তরখানে সাবিনা বলে– ভাইয়া তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।
–কী কথা রে?
–বলব, আগে খাওয়া-দাওয়া শেষ কর।
মাহিন কল্পনাও করেনি চিঠির কথা আর সাবিনার কথা একই সূতোয় গাঁথা। মাহিন বলে– ঠিক আছে খাওয়া-দাওয়া শেষে তোর কথা শুনব।
খাবার শেষে চিঠির কথা মনে পড়ে মাহিনের। চিঠি খোলতেই চোখ ছানাবড়া! একি? এতো মাসনার লেখা! তাহলে চৈতি মাসনার কথা বলেছে! মাসনা আমাকে ভালোবাসে? অনেকগুলো প্রশ্ন উঁকি দেয় মাহিনের মাঝে। তবে এ কী করে সম্ভব! ওরা কত ধনী পরিবার। মাসনা কত সুন্দরী মেয়ে। মাসনার জন্য আমাকে ওর মা-বাবা মেনে নেবে? না, এ সম্ভব নয়।

এর মধ্যে দরজায় নক করে সাবিনা– আয় সাবিনা বস। কী বলবি আপু বল!
–ভাইয়া একটা মেয়ে তোকে খুব বেশি ভালোবাসে। ভাবী হিসেবে আমারও তাকে খুব পছন্দ।
–কী বলিস এসব আজগুবি কথা?
–হ্যাঁ ভাইয়া! ওরা কাল আমাদের বাড়িতে এসেছিল।
–ওরা মানে? কয়জন ভালোবাসে আমাকে?
–না, হবুভাবীর বান্ধবীসহ এসেছিল সেটাই বুঝিয়েছি।
মাহিন অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সাবিনার দিকে। চিঠির ভাষা আর সাবিনার কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে! তার মানে সাবিনা সবকিছুই জানে?
–কী রে ভাইয়া চুপ করে গেলি যে? কিছু একটা বল!
–মেয়েটার নাম কী রে? সাবিনার কাছে জানতে চায় মাহিন।
–মাসনা। ওর নাম মাসনা। মাসনা আপু তোকে সত্যিই খুব ভালোবাসে ভাইয়া। পাগলের মতো ভালোবাসে। তোকে না পেলে সে মরে যাবে। মাসনা আপু অনেক ভালো মেয়ে। পুরো কলেজের মধ্যে সবচেয়ে ভদ্র এবং সুন্দরী। তোর সঙ্গে মানাবে বেশ।
–কীসব বকবক করছিস সেই তখন থেকে? এবার একটু দম নে। শোন!

ওরা ধনী আর আমি গরিব পরিবারের ছেলে। ওর সঙ্গে কি আমার চলে?
–আরে ভাইয়া ভালোবাসায় কোনো উঁচু-নিচু নেই। ভালোবাসা গরীব-ধনী দেখে হয় না। ভালোবাসা মনের ব্যাপার।

বর্তমান সময়ে এই যে যুবক-যুবতীদের একটা কমন ডায়লগ– 'ভালোবাসা ধর্ম-জাত বোঝে না, এটা মনের ব্যাপার!' এ সব সস্তা ডায়লগ ও অবৈধ সম্পর্ক এভাবেই সামাজিক পরিবেশ ও সৌহার্দ নষ্ট করে। কেননা, বিবাহপূর্ব ছেলে-মেয়ের সম্পর্কের মাধ্যমে কখনও অযোগ্য পাত্রে কন্যাদান আবার কখনও অযোগ্য পাত্রীতে ক্ষুণ্ন মান।

৩৪

আমেনা বেগম ভেতরে চলে যান। মেহমানের জন্য চা-বিস্কুট এনে দেন। চা খেতে খেতে জাহিদুলের সঙ্গে কথা বলেন মাহিনের বাবা জমির উদ্দীন। জাহিদুলের কথার শব্দ পেয়ে মাহিনও ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।
–আরে দোস্ত তুই চলে এসেছিস? তো কী খবর বল।
মাহিনের বাবা বলেন– বাবা মাহিন! তোর বন্ধু তো ভালো খবরই নিয়ে এসেছে! এবার ছেলে দেখতে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। তোরা দুইজন আলাপ করে চূড়ান্ত খবর জানা।
এই বলে চলে যান জমির উদ্দীন।
মাহিন বলে– খুব টেনশনে আছি দোস্ত। সাবিনার ভাগ্যে কী আছে আল্লাহই ভালো জানেন।
জাহিদুল সান্ত্বনা দিয়ে বলে– চিন্তা করিস না দোস্ত! সাবিনা শুধু তোর বোন নয়, আমারও বোন। কোনো ভাই কি চায় নিজের বোনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে? তুই নিশ্চিন্তে থাক। ছেলে যথেষ্ট ভালো এবং আলেম হিসেবেও ভালো।
–ঠিক আছে, তাদের ফোন দিয়ে দেখ তারা কী বলে।
মাহিনের অনুরোধে ঐ বৈঠকেই পাত্রপক্ষকে ফোন দেয় জাহিদুল। পাত্রপক্ষ পরদিন কনেপক্ষকে আমন্ত্রণ জানান।

– দোস্ত আজ উঠি। আগামীকাল দুপুরের আগেই তোরা ছেলের বাড়ি আসবি। কাল দুপুরে ছেলের বাড়িতে তোদের সঙ্গে আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ!
এই বলে চলে যায় জাহিদুল।

৩৫
সাবিনা মাহিনকে জিজ্ঞেস করে– কী রে ভাইয়া কিছুই তো বললি না! জাহিদুল ভাইর কথা শুনেই চলে গেলি।
–আমি এখনও কিছু ভাবিনি। ভেবে তোকে জানাব।
মাসনা যে মাহিনকে চিঠি লিখেছে, সেটা সাবিনাকে জানায় না মাহিন। মাহিন ভাবতে শুরু করে– মাসনার প্রতি কি কোনো টান আছে তার? মাসনার দেওয়া চিঠিটা বারবার খুলে দেখে সে। টান না থাকলে চিঠিটা কেন বারবার খুলে দেখবে? নিজেকে প্রশ্ন করে মাহিন। বুঝতে পারে– মাসনার প্রতি তার একটা টান আছে।

মূলত এভাবেই একটি কর্মঠ ও মেধাবী ছেলের জীবন নষ্ট করে দেয় প্রেমিকাবেশি শত্রু। আবার কখনও একটি শান্ত-শিষ্ট মেয়ের সাদা চরিত্রে কলঙ্কের দাগ টেনে দিতে পারে প্রেমিকবেশি শয়তান। মাহিনের জীবনটাও ধ্বংসের জগতে পদার্পন করতে শুরু করে এভাবেই।

৩৬
সুন্দরী মেয়ে মাসনার কথা ভাবতে ভাবতেই রাত কেটে যায় মাহিনের। মাসনা-মাহিন দুজনই জীবন নিয়ে তামাশায় মেতে ওঠে। এই সাময়িক আনন্দ যে তাদের কাল হয়ে দাঁড়াবে- সে হিসেবও করে না তারা।
পরদিন একটু সাজগোজ করেই ঘর থেকে বের হয় মাহিন। সাজগোজ করে মাসনাও। মাহিন ক্লাসে ঢোকে। ঢুকতেই নজর পড়ে মাসনার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয় মাহিন। লজ্জা পেয়ে নজর ঘুরিয়ে

নেয় মাসনাও।

একদিকে লজ্জা অন্যদিকে ভয়- মাহিন আমার ডাকে সাড়া দেবে তো! আমার চিঠি গ্রহণ করেছে তো! যদি গ্রহণ করে তাহলে নিশ্চয়ই উত্তর লিখেছে। গ্রহণ না করলে উত্তর লিখবে না। মাসনা অপেক্ষায় থাকে মাহিনের উত্তরের। কিন্তু মাহিন উত্তর লেখেনি এখনও। মাহিন বুঝে উঠতে পারে না কী করবে। হ্যাঁ বলবে, নাকি না।

ক্লাসের ফাঁকে কলেজের পেছনে যে গাছের নিচে বসে সময় কাটাত, আজও সেই গাছের নিচে চলে যায় মাহিন। ভাবে– মানসিকভাবে যে টেনশন নিয়ে বেড়াই, মাসনার ভালোবাসায় সাড়া দিলে সে টেনশন কমবে? ওর ভালোবাসা দিয়ে আমার জীবন রাঙিয়ে তুলতে পারব কি! নাকি আরও অবনতি হবে? নানা চিন্তা ঘিরে ধরে মাহিনকে। এদিকে আড়াল থেকে মাহিনকে ফলো করে মাসনা ও চৈতি।

চৈতিকে মাসনা জিজ্ঞেস করে– মাহিনের সামনে যাব?

–না না! একটু অপেক্ষা কর! দেখি মাহিন ভাই কী করে। এক-দুইদিন সময় দিতে হবে তো! আর এই সময়টাতে তোকেও ধৈর্য ধরতে হবে; বলে চৈতি।

পরবর্তী ঘণ্টার টুনটুনি বেজে ওঠে। ক্লাসে ঢোকে মাহিন। কলেজ ছুটি হতে এখনও অনেক সময় বাকি। চৈতি আর মাসনা ফন্দি আঁটে- এই সময়ে মাহিনকে বাগে আনতে হবে। কিন্তু মাহিন দুটি ক্লাস বাকি রেখেই বাড়িতে চলে যায়! একমাত্র বোন সাবিনার পাত্র দেখতে যেতে হবে তাই।

ক্লাস শেষে মাসনা ও চৈতি বাড়ির পথ ধরে। চৈতি মাসনাকে বলে– মাহিন ভাইর বোন সাবিনার বিয়ে। সেসব নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন তিনি। অন্তত এই সময় তাকে ডিস্টার্ব করা যাবে না। আমার বিশ্বাস, তোর চিঠি পাওয়ার পর মাহিন ভাই নিশ্চয়ই তোকে নিয়ে কিছু একটা ভাবছেন। সাবিনার বিয়ের পর বুঝা যাবে।

চৈতি দুটি ছেলে-মেয়ের জীবন ধ্বংসের ওকালতি করে! ইসলামী জ্ঞান না থাকায় বান্ধবীর স্বপ্ন পূরণের নামে মাসনা আর মাহিনের জীবনকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয় সে। তাও কত চেষ্টা তদবীর ও কৌশলের মাধ্যমে! জীবননাশের জন্য এভাবে কেউ কষ্ট করে? হ্যাঁ করে! আমাদের সমাজের ভ্রান্ত ও ইসলামী জ্ঞানহীন যুবক-যুবতীরা করে। সিনেমা

নাটকও আজ এই প্রেমনির্ভর। এসব নষ্টামী ছাড়া কোনো নাটক সিনেমা নেই।

৩৭

দুপুরের আগে মাহিনের বাবা জমির উদ্দীন, বড়ভাই রাশেদ এবং মাহিন, এই তিনজন মিলে রওয়ানা হয় পাত্র দেখার উদ্দেশ্যে। পাত্রের বাড়ি মাহিনদের বাড়ির কয়েক গ্রাম পর। পাত্রের এলাকার বাজার থেকে পান সুপারি ও মিষ্টিসহ পাত্র দেখতে যেতে সামাজিকভাবে আরও যা যা নেওয়া দরকার, সবই নেয় মাহিন। এদিকে বাজারের দুই-এক ব্যবসায়ী থেকে ছেলের বায়োডাটা জানার চেষ্টা করেন জমির উদ্দীন। পাত্রের ব্যাপারে সবার মন্তব্যই পজেটিভ।

দুপুর নাগাদ ছেলের বাড়ি পৌঁছে মাহিনরা। ওদিকে পূর্ব থেকেই ছেলের বাড়িতে অপেক্ষায় থাকে জাহিদুল। বাড়ির দরজা থেকে মাহিনদের সংবর্ধনা জানায় সে। মাহিনদের জন্য শরবৎ পিঠা ও দারুণ নাস্তার আয়োজন করে পাত্রপক্ষ। পাত্র নিজ হাতেই মাহিনদের আপ্যায়ন করান! মজার ব্যাপার হলো- মাহিনরা ঘুর্ণাক্ষরেও বোঝতে পারেনি তিনিই পাত্র!

–ছেলে কোথায়?

জাহিদুলকে ছোট্ট করে জিজ্ঞেস করেন জমির উদ্দীন।

–জাহিদুল মুচকি হেসে বলে, চাচা! এতোক্ষণ আপনাদের যে লোকটি আপ্যায়ন করিয়েছেন, তিনিই পাত্র।

জাহিদুলের কথা শুনে জমির উদ্দীন আনন্দে আটখানা। এত ভদ্র, কী অমায়িক ব্যবহার! এই ছেলের হাতে যদি সাবিনাকে তুলে দিতে পারি- সত্যিই সাবিনা অনেক সুখি হবে। দেখতে সুন্দর, লম্বা-চওড়া, কথাবার্তা মাধুর্যপূর্ণ, নিরহঙ্কারী।

৩৮

জমির উদ্দীন ছেলের নাম জানতে চান। জাহিদুল বলে– তিনি আমাদের বড়ভাই। মাদরাসার বড়ভাই। আমি যে মাদরাসায় লেখাপড়া করি, ভাই ওখান থেকেই দাওরা (আরবী মাস্টার্স) শেষ করেছেন। ভাইর তত্ত্বাবধানেই আমি মাদরাসায় ছিলাম। বেশ সুনাম তাঁর। ভাইকে মাদরাসায় সবাই একনামে চেনে। এলাকায়ও বেশ সুনাম রয়েছে। ভাইর নাম 'মাওলানা জিয়াউদ্দিন মহসিন'। আমরা মহসিন ভাই বলে ডাকি।

তার বাবা নেই। চারভাইয়ের মাঝে মহসিন ভাই ছোট। বড় তিনভাই সবাই দূরে থাকেন। কাজের ব্যস্ততায় আসতে পারেননি। তবে আল্লাহ কবুল করলে মূল কাজের সময় সবাই থাকবেন।

জমির উদ্দীন মাওলানা মহসিনকে কাছে ডাকেন– বাবা! তোমরা কি আমাদের বাড়ি দেখেছ? আমরা কিন্তু নিতান্তই গরীব। আমাদের আলেমপাত্র পছন্দ। আমাদের মেয়েরও তাই। আমাদের একমাত্র মেয়ে। ওর সুখের জন্য আমরা আলেমপাত্র নির্বাচন করেছি। তোমরা যদি আগে থেকেই আমাদের বাড়ি-ঘর ও সামাজিক অবস্থান দেখে থাকো, তাহলে তোমরা মেয়ে দেখতে যেতে পারো। তোমাকে আমাদের পছন্দ হয়েছে। এই বলে পাত্রের বাড়ি থেকে বিদায় নেন জমির উদ্দীন।

৩৯

মাওলানা মহসিন জাহিদুলকে বলেন– তোমার মুখে তাদের যতটুকু প্রশংসা শুনেছি, আমার কাছে মনে হয় তারা আরও বেশি প্রশংসাপ্রাপ্য। তাদেরকে আমার পছন্দ হয়েছে। আশা করি তাদের মেয়েও আমার পছন্দ হবে এবং আল্লাহ চাইলে আমাদের সংসার সুখেরও হবে ইনশাআল্লাহ। তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

–ঠিক আছে মহসিন ভাই! আর ধন্যবাদ দিতে হবে না। এবার আপনার বড়ভাইদের খবর দিন। মেয়ে দেখে বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করুন। সাবিনা শুধু মাহিনের বোন নয়, আমারও বোন। রাজকন্যা ফেল আমার

বোনের কাছে। আমার বোনকে যে দেখবে- সেই পছন্দ করতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ। এখন আপনি সিদ্ধান্ত জানান আমাকে।
–ইনশাআল্লাহ! আমি বড়ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে দিন তারিখ ঠিক করব। তার আগে আমি একাকি মেয়ে দেখে আসব।

এদিকে মাহিনদের অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকেন আমেনা বেগম। সাবিনা যোহরের নামায পড়ে কোরআন তেলাওয়াত করে, জায়নামাযে বসেই আল্লাহ তাআলা দরবারে দুই হাত তুলে চোখের পানিতে দোয়া করে– 'আল্লাহ! তোমার মর্জি মতো ইসলামপালনকারী একজন নেকআমলদার স্বামী মিলিয়ে দাও আমায়! যে ছেলেকে দেখতে আমার বাবা ভাইয়েরা গিয়েছেন, সেই ছেলে যদি আমাকে দীনের ওপর রাখতে পারে, তাহলে আমার বাবা-ভাইয়ের চোখে ওই ছেলেকে অসম্ভব সুন্দর করে দাও!'
দীনদার মেয়েরা বিয়ের পূর্বে নেককার স্বামীর জন্য এভাবেই জায়নামাযে আল্লাহর কাছে দোয়া করে থাকেন। এজন্য বেশিরভাগ দীনদার মেয়েদের স্বামী ভালো হয়– নেককার স্বামী মেলে এবং সংসারও সুখের হয়। আর তাদের সংসারেই নেককার ও ভদ্র সন্তান জন্ম নেয়।
সাবিনা আলেমপাত্র পছন্দ করার মূল কারণ হলো- বর্তমান সময়ে সাংসারিক দুর্দশার মাঝে, আলেম পরিবারগুলোকেই সুখী দেখা যায়। তার এক বান্ধবী হুজুর স্বামী পেয়ে সবসময় সাবিনার সঙ্গে তার গুণাগুণ গেয়ে বেড়ায়। ফলে সাবিনা ধীরেধীরে হুজুর স্বামী পছন্দ করতে শুরু করে।

৪০

আসর নাগাদ বাড়ি পৌঁছেন জমির উদ্দীন। মাহিনদের দেখে আমেনা বেগম বলে ওঠেন– কী খবর! আমি খুব পেরেশানির মধ্যে সময় কাটিয়েছি।
জমির উদ্দীন বলেন– পেরেশানীর কিছু নেই। আগে বসতে দাও! অনেক দূর থেকে এসেছি। একটু শান্ত হয়ে নিই!

আমেনা বেগম স্বামী জমির উদ্দীনকে পান বানিয়ে দেন। জমির উদ্দীন পান মুখে দিয়ে বলেন– সংবাদ অনেক ভালো আলহামদুলিল্লাহ। কল্পনাও করতে পারিনি এত সুন্দর ছেলে আমরা পাব। এখন ভালোয় ভালোয় ছেলে যদি সাবিনাকে পছন্দ করে, তাহলে আর দেরি করব না। দ্রুতই আকদ সেরে ফেলব ইনশাআল্লাহ।

দরজার ওপাশ থেকে সব শোনে সাবিনা। বাবার মুখে পাত্রের প্রশংসা শুনে, নিজের ঘরে গিয়ে দু'রাকাত শোকরানা নামায আদায় করে নেয়। নামায শেষে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বলে– 'হে পরওয়ারদিগার! তুমি হয়ত আমার দোয়া কবুল করেছ। বাকি জীবনটা আমার চাওয়া-পাওয়া সব তোমার কাছেই থাকবে। আল্লাহ তুমি আমার মা-বাবাকেও কবুল করো! আমার ভাইদেরকেও কবুল করো! তাদের কষ্ট বৃথা যেতে দিও না! তাদের টেনশন, কোরবানি ও চিন্তাকে আনন্দে রূপান্তিত করো!'

৪১

সাবিনার বিয়ে সংক্রান্ত ব্যস্ততায় আজ প্রাইভেট পড়াতে যায়নি মাহিন। দু'দিনের দৌড়াদৌড়িতে বেশ ক্লান্ত। আসরের পর ক্লান্তি দূর করার জন্য হাঁটতে বের হয় মাহিন। এলাকার ছেলেরা আসরের পর খেলাধুলা করে, আনন্দ উল্লাস করে। মাহিন ঐ সময়টায় হেঁটে বেড়ায় এবং এলাকার ছোটভাইদের খেলাধুলা উপভোগ করে।

আজ গ্রামের রাস্তায় বের হতেই পাশের গ্রামের একক্লাসমেটের সঙ্গে দেখা হয় মাহিনের। ক্লাসমেট নতুন সাইকেল কিনেছে। শখের বসে সাইকেল চালাতে চালাতে মাহিনদের গ্রামে চলে আসে সে। মাহিনকে দেখেই ক্লাসমেট বলে– বন্ধু নতুন সাইকেল কিনেছি। ওঠ! চল আজ তোকে নিয়ে ঘুরব।

মাহিনও কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই ক্লাসমেটের সাইকেলে উঠে বসে। সাইকেলে চড়ে দুইবন্ধু গল্পে মজে ওঠে। সাইকেল এক গ্রাম পেরিয়ে আরেক গ্রামে ঢুকে পড়ে। ঐ গ্রামেই মাসনাদের বাড়ি।

– এ কোথায় নিয়ে এলি বন্ধু! সন্ধ্যা হয়ে গেলো যে! চল চল বাড়ি

ফিরতে হবে; বলে মাহিন।
কিন্তু কপাল খারাপ! ঐ মুহূর্তে সাইকেলের চাকা লিক হয়ে যায়! ক্লাসমেট পাশের বাজারে চাকা সারতে পারে কী না তা খোঁজতে চলে যায় আর মাহিন পায়ে হেঁটে বাড়ির পথ ধরে।

৪২

মাসনাদের বাড়ির সামনে দিয়েই যেতে হবে মাহিনকে। সেদিন মাসনা আসরের পর পুকুরঘাটে বসে কোনো একটা কবিতার বই পড়ছিল। মাসনাদের বাড়ির পুকুরটা ঠিক রাস্তা ঘেঁষেই ছিল। ফলে রাস্তা দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে পুকুরঘাট থেকে সহজেই দেখা যেত।
মাহিন দ্রুত কদমে হাঁটে বাড়ির দিকে। সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ি পৌঁছুতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে যখন মাসনাদের বাড়ি অতিক্রম করছিল– তখনও মাসনা পুকুরঘাটেই ছিল।
হঠাৎ নজর পড়ে রাস্তার দিকে। তাকিয়ে দেখে মাহিন হেঁটে যায়! কিন্তু বিশ্বাস হয় না মাসনার। এদিকে কেন আসবে মাহিন? তাহলে কি আমার জন্য এই গ্রামে এসেছে? মাসনা দৌড়ে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ায়। পেছন থেকে মৃদুস্বরে মাহিনকে ডাকে সে। মাহিন পেছনে তাকিয়ে যা দেখে, তার জন্য প্রস্তুত ছিল না।
মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে মাসনা। মাহিন লাজুক চেহারায় মাসনার দিকে ছোট ছোট কদমে এগোতে লাগে। মাসনা ভয়-আনন্দে শিহরিত হয়ে কাঁপতে শুরু করে। মাহিন মাসনার সামনে চলে আসে। কেউ কিছু বলছে না।
–কিছুই তো জানালে না। আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে আমার? মাহিনের কাছে জানতে চায় মাসনা।
–কিছুক্ষণ চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মাহিন বলে, তোমাদের পরিবার আর আমাদের পরিবার এক নয়। তুমি ধনী পরিবারের মেয়ে, আর আমি গরিব পরিবারের ছেলে। সমাজ মেনে নেবে না আমাদের। আমাদের পরিবারও এ সম্পর্ক মেনে নেবে না। যে সম্পর্কের সমাপ্তি হবে বিচ্ছেদের মাধ্যমে, সে সম্পর্ক গড়া থেকে না করাই ভালো। বরং তুমি

পাগলামো ছাড়ো।
এই বলে চলে যায় মাহিন। মহিনের পথের দিকে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রয় মাসনা। দু'চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়ায় তার। চোখের দৃষ্টিতে যতক্ষণ মাহিনকে দেখা যায়- ততক্ষণ তার পথে তাকিয়ে থাকে মাসনা। মাহিন চোখের আড়ালে চলে গেলে ওড়না দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘরে চলে যায় সে।

৪৩

এদিকে জাহিদুল খবর জানায়, আগামীকাল ছেলেপক্ষ সাবিনাকে দেখতে আসবে। মাহিনের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। ছেলেপক্ষ আসছে মানে সবকিছুর আয়োজন মাহিনকেই করতে হবে। এদিকে সাবিনা নিজ হাতে বিছানাপত্র গোছায়। নিজ হাতের অঙ্কিত নকশা সমৃদ্ধ বালিশের কাভার, বিছানার চাদর, হাতপাখা, ওয়ালমেট সবকিছু ফজরের পর থেকেই সাজাতে শুরু করে সাবিনা।
মাহিন আয়োজনে ব্যস্ত। বাবা জমির উদ্দীন চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখেন। আমেনা বেগম মেহমানদের রান্না নিয়ে ব্যস্ত। বড়ভাই রাশেদ শুধু ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর ফরমান জারি করছেন। রাশেদ সবার কাছেই অকর্ম ও মানবিকতাহীন বলে পরিচিত।
সকাল গড়িয়ে দুপুর। ইতোমধ্যে বরপক্ষ নিয়ে হাজির জাহিদুল। মাহিনের বাবা সামনে এগোন। জমির উদ্দীনকে দেখেই জাহিদুল সালাম দেয়– "আসসালামু আলাইকুম"।
মাহিনও দৌড়ে যায় বরপক্ষকে অভ্যর্থনা জানাতে। এদিকে খবর পেয়ে সাবিনা জানালার আড়াল থেকে ছেলেকে দেখার চেষ্টা করে। এত এত লোকের মাঝে পাত্র ঠিক চেনতে পারে না সাবিনা। যার সঙ্গে জীবন বাঁধবে- তাকে একটু দেখার শখ কার নেই!
আয়োজন সম্পন্ন। এবার কনে দেখার পালা। সাবিনা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। কীভাবে সামনে যাবে, কী করতে হয়, কী বলতে হয়, তারা কী প্রশ্ন করবে- এসবের কিছুই জানে না সাবিনা। লোকমুখে শুনেছে হেঁটে দেখাতে হয়, চুল খুলে দেখাতে হয়, কথা বলে শোনাতে হয়, কবিতা

আবৃত্তি করতে হয়, গান শোনাতে হয়, যেন কোরবানির পশু!

কিন্তু সাবিনারা জানে না- ইসলামে এসবের কোনো নির্দেশনা নেই। কোনো আলেমপাত্র এসব করেন না। ইসলামের নির্দেশনা শুধু চেহারা এবং হাতের কব্জি পর্যন্ত দেখার। পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত এবং মাসআলা-মাসায়েল জানার অনুমতি আছে। তবে পাত্রীকে সন্দেহ হলে বরপক্ষের মহিলারা গিয়ে দেখে আসবেন।

৪৪

আমেনা বেগম কিচেন রুমে শরবৎ বানান। কিন্তু বারবারই চোখের পানিতে শরবৎ নষ্ট হয়ে যায়। মাহিনের বাবা জমির উদ্দীন দেরি হতে দেখে সরাসরি কিচেনে চলে যান– কী গো! এত দেরি কেন?
আমেনা বেগমের জবাব নেই। কাছে গিয়ে দেখেন তিনি কাঁদছেন! শুধু কেঁদেই যাচ্ছেন।
জমির উদ্দীনও নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না। তবে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করেন। আমেনা বেগমের মাথায় হাত রেখে বলেন– কাঁদার কী আছে। মেয়ে হয়ে জন্মালে তো স্বামীর বাড়ি যেতেই হয়। আজ না হয় কাল; বিদায় তো দিতেই হতো। আমেনা বেগম বলেন, তাহলে তোমার চোখে পানি কেন?
লা-জবাব বনে যান জমির উদ্দীন। ওদিকে সাবিনা মাকে দেখতে চায়। সাবিনাকে প্রতিবেশী খালা-চাচিরা ছেলের সামনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করছেন। প্রতিবেশী একচাচী আমেনা বেগমকে ডাকেন; ভাবি আপনাকে দেখতে চায় সাবিনা।
আমেনা বেগম সাবিনার কাছে গিয়ে বসেন। বসতেই সাবিনা মাকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। আমেনা বেগমও কাঁদেন।
– আমি তোমাদের ছেড়ে কীভাবে থাকব মা! অন্য পরিবেশে আমি কীভাবে নিজেকে মানিয়ে নেবো! তারা আমাকে আপন ভাববে তো; কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে সাবিনা।
প্রতিবেশী মহিলারা সান্ত্বনা দিয়ে বলেন– আমাদেরও একদিন তোর

মতো এভাবে স্বামীর বাড়ি আসতে হয়েছে মা! সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের এলাকার সবচেয়ে শান্ত-শিষ্ট মেয়ে তুই। তুই শুধু আমেনা বেগমের মেয়ে না, আমাদের সবার মেয়ে। আমাদেরও খুব কষ্ট হচ্ছে তোকে বিদায় দিতে হবে ভেবে।

তবে মন খারাপ করিস না। শুনেছি ছেলে নাকি খুব ভালো। তোকে সুখেই রাখবে। তা ছাড়াও এইতো দুই-তিনগ্রাম পরই ছেলের বাড়ি। তোর যখন মন চাইবে তখনই চলে আসবি, আবার আমাদের যখন তোকে দেখতে মন চাইবে আমরাও তোকে দেখতে চলে যাব।

প্রতিবেশীর কথা শুনে এক ধ্যানে তাকিয়ে থাকে সাবিনা। আজ সবাই কত ভালোবাসে আমায়। এদের ছেড়ে থাকতে পারব কী? কয়েক মুহূর্তের জন্য পুরো ঘরজুড়ে সুনসান নিরবতা নেমে আসে।

৪৫

সামনের ঘর থেকে আওয়াজ আসে– কই গো! কিছু হলো!

জিজ্ঞেস করেন জমির উদ্দীন। মাহিনের মা সেমাই-নাস্তা রেডি করে দরজায় নক করেন। মাহিন গিয়ে নাস্তা নিয়ে বরপক্ষকে মেহমানদারী করায়। এখন শুধু মেয়ে দেখা বাকি। সাবিনাকে সাজিয়ে বসিয়ে রেখেছেন প্রতিবেশী চাচী-খালারা। মাওলানা মহসিন সঙ্গে আসা বন্ধুদের বাইরে যেতে বলেন। মাহিনের বাবা জাহিদুলকে জিজ্ঞেস করেন– তোমরা থাকলে কী সমস্যা বাবা?

–চাচা! মেয়ে দেখার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ছেলেই মেয়েকে দেখতে পারে, অন্য কেউ নয়। এমনকি বিয়ের আগে ছেলের বাবাও নন। তবে মহিলারা দেখতে অসুবিধা নেই। ইসলামী শরিয়তে মাহরাম (যাদেরকে বিবাহ করা হারাম) ছাড়া অন্য কেউ মেয়ে দেখতে পারে না। বিয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পাত্র দেখতে পারে।

পাত্র ছাড়া সবাই বাইরে চলে যায়। মাওলানা মহসিন সাবিনার অপেক্ষায়। মাহিন সাবিনাকে নিয়ে গুটি গুটি পায়ে সামনের ঘরের দিকে এগোয়। লম্বা ঘোমটায় লাল টুকটুকে শাড়ি আবৃত সাবিনা। শক্ত করে মাহিনের হাত ধরে রাখে সে। মাহিন খুব ভালোভাবেই টের পায় সাবিনা

কাঁপছে এবং ভয় পাচ্ছে। সালাম দিয়ে সামনের ঘরে প্রবেশ করে সাবিনা। সালামের জবাব দিয়ে টেবিলের ওপাশের চেয়ারে সাবিনাকে বসতে বলেন মাওলানা মহসিন।

মাহিন পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে। এমন চঞ্চল ও দুষ্টু-মিষ্টি একটা ছেলে কেমন অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে! মনে হয় জীবনের সব থেকে দুর্বল সময়টা ফেস করছে মাহিন। মূলত সাবিনার বিদায় সূর বেজে ওঠা-ই সবার দুর্বলতার কারণ। মাওলানা মহসিন বলেন– আপনাদের দুর্বল হওয়ার কোনো কারণ নেই। চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

মাওলানা মহসিনের মুখে এমন কথা শুনে সাবিনা ভেতরে ভেতরে খুশি হয়। আল্লাহ আমার কথা শুনেছেন তাহলে। যিনি এত সুন্দর কথা বলতে পারেন, তিনি আমার জীবনটাও রাঙিয়ে তুলতে পারবেন। এমন একজন সঙ্গীই চেয়েছি আমি।

৪৬

মাওলানা মহসিন মাহিনকে লক্ষ্য করে বলেন– একটু ঘোমটাটা যদি উঠাতেন!

মাহিন আস্তে করে ঘোমটা উঠায়। লজ্জায় লাল হয়ে মাথা নিচু করে আছে সাবিনা। মাওলানা মহসিন সাবিনার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। এত সুন্দর করে আল্লাহ সাবিনাকে বানিয়েছেন! শুধু চোখ নয়- মনও জুড়িয়ে যায়। সাবিনাকে চোখ বন্ধ করে থাকতে দেখে মাহিন একটু রাগতস্বরে বলে, তাকাস না কেন? তাকা!

মাওলানা মহসিন মাহিনকে বারণ করে বলেন– এ সময় ওর সঙ্গে রাগ করা ঠিক হয়নি আপনার। একটি মেয়ের জন্য সবচেয়ে কঠিন মুহূর্ত এই সময়। সে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে না, চিন্তা ভয় আরও নানা কারণে ঠিক এই সময় মেয়েরা চরম নার্ভাস ফিল করে। সাবিনা মাওলানা মহসিনের মুখে এই সময় এমন কথা শুনে পায়ের নিচে মাটি পায়। মাওলানা মহসিনের ব্যবহারে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হতে থাকে সাবিনা। এবার চোখ খোলে সে। মাওলানা মহসিনের দিকে একনজর

তাকিয়ে- লজ্জায় আবার চোখ বন্ধ করে ফেলে। সাবিনা ভাবছে এখান থেকে বের হতে পারলেই মুক্তি।
মাওলানা মহসিন সাবিনার এমন অবস্থা দেখে মুচকি হাসেন। বলেন– আমার আর দেখার কিছু নেই। একটু তেলাওয়াত শোনার আগ্রহ আছে।
মাসনা কাঁপা কাঁপা গলায় সূরা ফাতিহার তিন-চারআয়াত শুনায়।
'আলহামদুলিল্লাহ! আর প্রয়োজন নেই; বলেন মাওলানা মহসিন।
এই জামানায় মেয়েদের তেলাওয়াত শুদ্ধ হওয়া একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার। আমি ভাবিনি তেলাওয়াত এত সুন্দর হবে। সাবিনার তেলাওয়াতের উচ্চারণও যথেষ্ট শুদ্ধ ও মুগ্ধকর।

৪৭
মাওলানা মহসিন সাবিনাকে একটি বই উপহার দেন। 'তালিমুদ্দীন' নামক একটি বই। হযরত আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির লিখিত বইটি নারীদের জন্য বেশ উপযোগী। ছোট্ট একটি চিরকুট লেখা ছিল তার মধ্যে। মাওলানা মহসিন আগের রাতেই ঐ চিঠিটি লিখে রাখেন। মনে প্রবল ধারণা ছিল- সাবিনাকে তার পছন্দ হবেই। পছন্দ হলে বইটি উপহার দেবেন, যার মধ্যে চিঠিটাও থাকবে। আল্লাহর রহমতে মেয়ে পছন্দ হওয়ায় বইটি হবু স্ত্রীকে হাদিয়া দিয়ে আসেন মাওলানা মহসিন।

অনেকে মেয়ে দেখার পর গলায় চেইন পড়িয়ে দেয়। হাতে আংটি পড়িয়ে দেয়। এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। মূলত টাকা বা এগুলোর কোনোটা দিতেই অসুবিধা নেই। কিন্তু বিয়ের আগে মেয়ের হাত স্পর্শ করে কিছু দেওয়া শরীয়ত সমর্থন করে না।

কনে দেখা পর্ব শেষ। সাবিনাকে নিয়ে ঘরে চলে যায় মাহিন। ভেতরের ঘরে প্রবেশ করেই সাবিনাকে টিপ্পনী কেটে ক্ষেপানোর জন্য মাহিন বলে– যাক বাবা! এবার আপদ বিদায় হলো বলে। আমিও এক বাঁচা

বেঁচে যাব।
–ভালো হচ্ছে না কিন্তু ভাইয়া!
মাহিনকে বলে সাবিনা। সাবিনা ভেতরে গিয়ে পোশাক পাল্টিয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া স্বরূপ দুইরাকাত নামায আদায় করে নেয়। মাহিনের বাবা ঘরে প্রবেশ করেন। মাওলানা মহসিন বলেন– সাবিনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। শুধু পছন্দ নয়, যা চেয়েছি তার চেয়ে বেশি পেয়েছি। এখন আপনারা যেদিন বলবেন সেদিনই আকদ হবে।
জমির উদ্দীন আনন্দে কেঁদে ফেলেন। চোখের পানি আড়াল করতে গিয়ে কাঁধের গামছা দিয়ে মুখ মোছার ভান করলেও মাওলানা মহসিনের নজর এড়াতে পারেননি।
মাওলানা মহসিন বলেন– দেখুন আপনারা চিন্তিত হবেন না। আমার বাবা নেই। আপনার মেয়েকে বিয়ে করলে আমার বাবার অভাবটা পূরণ হবে অন্তত। বাবার চোখে পানি দেখলে কোনো সন্তানই সহ্য করতে পারে না।
মাওলানা মহসিনের কথা শুনে তার প্রতি সবার বিশ্বাস ভালোবাসা ও আস্থা বেড়েই চলে।

জমির উদ্দীন বলেন– ঠিক আছে, তিনদিন পর আমাদের বাজার মসজিদে আকদ সম্পন্ন করব। তুমি চাইলে তোমাদের বাড়ির মসজিদেও সম্পন্ন হতে পারে।
মাওলানা মহসিন বলেন– না না ঠিক আছে, আপনাদের মসজিদেই হবে। তবে "আমি ভাইদের সঙ্গে আলাপ করে নিই" বলে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষে চলে যান মাওলানা মহসিন।
৪৮
বিকেলে বাড়ির পেছনের উঠানে বসে সাবিনার বিয়ের কেনাকাটার লিস্ট করে মাহিন। সাবিনা পেছন থেকে গিয়ে থাবা দিয়ে কাগজ কলম হাতে নিয়ে নেয়– দেখি দেখি তুই কি লিখছিস! এত লম্বা লিস্ট! ভাইয়া এত টাকা তুই পাবি কই? সংসারের হাল তো তোকেই টানতে হয়। আবার আমার জন্য এত টাকা খরচ করবি? কত কষ্ট করতে হবে তোকে! আমার এত কিছুর প্রয়োজন নেই। বড়ভাইয়া টাকা দিলে তুই লিস্ট বড় কর, নাহয় না।

মাহিন বুঝতে পারে যত যাই হোক, ভাইয়ের প্রতি বোনের টান বা ভালোবাসা ভিন্নরকমই হয়। এ ভালোবাসায় নেই কোনো খাঁদ। নেই কৃত্রিমতা।

মাহিন প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে সাবিনাকে বলে– গতকাল মাসনার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।

–কী বলিস! তাই নাকি? আচ্ছা ভাবীর সঙ্গে কী কথা হয়েছে তোর?

–আগে বল ভাবী বললি কেন?

–দু'দিন পর যে আমার ভাবী হয়ে আসবে, তাকে আগ থেকেই ভাবী ডাকার প্র্যাকটিস করছি।

– মাসনা আমাকে আগেই চিঠি দিয়েছে, কিন্তু তোকে বলিনি। সাক্ষাতে ওকে বলে দিয়েছি- পারিবারিক সামাজিক কোনো দিক থেকেই আমাদের সম্পর্ক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমি এটুকু বলে চলে এসেছি।

–এটা কোনো কাজ করলি ভাইয়া? আচ্ছা তুই এখন কী করবি বল তো!

–চারদিক ভেবেই এগোতে চাই আমি। এসব সম্পর্ক টেকে না রে বোন! যে সম্পর্কের শেষটা বিচ্ছেদ দিয়ে খতম হয়, সে সম্পর্কটা গড়ে নিজেকে কষ্ট দিতে চাই না। কারণ ওদের পরিবেশ আর আমাদের পরিবেশ এক নয়। আমাদের পরিবেশে একটা ইসলামী ভাবধারার মানসিকতা আছে, ওদের তা নয়। মাসনা অনেক সুন্দরী, জ্ঞানী, মেধাবী মানছি, কিন্তু কতটা ভদ্র হবে, সাংসারিক জীবন কতটা সুখের হবে, তা কি বলা যায়?

প্রেমের জীবন সুখের হলেও সাংসারিক জীবন সুখের হয় না। প্রেমের জীবনে কেউ কারও ভুল ধরে না। ভুল করলেও সেগুলো চোখে বাধে না। কেননা, তখন প্রেমে অন্ধ থাকে প্রেমিক-প্রেমিকা। ফলে ভালোমন্দ যাচাই করার সুযোগ থাকে না। আর এটা শয়তানের বড় একটা ধোঁকা। যখন একছাদের নিচে বসবাস শুরু হয়, তখনই ভুল-ত্রুটিগুলো সামনে চলে আসে। দায়বদ্ধতা বেড়ে যায়। ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয়।

প্রেমের জীবন আর সংসার জীবন এক না হওয়ায় প্রেমের জীবনটাই ভালো ছিল বলে অনুভূত হয়। আসলে প্রেমের জীবনটাই হলো কলঙ্কজনক জীবন। মাসনা যদি আমার জীবনে সুখ বয়ে আনতে পারে,

তাহলে বিয়ের মাধ্যমে আসুক, প্রেমের মাধ্যমে নয়। তবে আমি এও জানি; ওদের পরিবার বিয়ের মাধ্যমে ওকে আমার হাতে তুলে দেবে না।

৪৯

সাবিনা বলে– মাসনা আপু এমন মেয়েই নয়! বরং বিয়ের পর তোকে আরও সুখে রাখবে। এটা আমার বিশ্বাস।

–তুই কি সবাইকে তোর সঙ্গে তুলনা করিস? সবাইকে তোর মতো ভাবিস! তুই যার ঘরে যাবি তার ঘরটা রাঙিয়ে তুলবি, তোর মতো মেয়ে পৃথিবীতে বিরল। তোর মনটা ভালো তাই ভাবিসও ভালো। কিন্তু সরল মনের বিশ্বাস, আবেগ আর বাস্তবতা এক নয়। দোয়া করিস তোর হতভাগা ভাইটা যেন অন্তত সাংসারিক জীবনে স্ত্রী নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। অল্পবয়সে বাবা-মা, ভাই-বোন থেকে কষ্ট তো কম পাইনি! অমূল্যায়নের শিকার কম হইনি। সাংসারিক জীবনে যদি আদর্শবান স্ত্রী পাই, হয়ত বিবাহপূর্ব যন্ত্রণা কিছুটা হলেও কমবে।

–ঠিক আছে, তাহলে মাসনা আপুকে তুই সরাসরি না করে দে! শুধু শুধু ওকে ঝুলিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না।

–মাহিন মুচকি হেসে বলে, আরে পাগলী! মাসনাকে আমিও ভালোবেসে ফেলেছি রে! তবে একটু বাজিয়ে দেখছি।

সাবিনা মাহিনের গাল টেনে– "তবে আমার দুষ্টু ভাইয়া! এবার ঠিকই আছে"- এতদিন আমারে জ্বালিয়েছিস, এবার বউয়ের জ্বালা সামলাবার ব্যবস্থা করতেছি! আমি না তোকে জ্বালাই? এবার তোদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি! সাবিনা আউট মাসনা ইন।

হা হা করে হেসে ওঠে সাবিনা।

–হ্যাঁ হ্যাঁ! এতদিন তুই আমাকে জ্বালিয়েছিস, এবার যা মাওলানা মহসিনকে জ্বালা। আমি তোর যন্ত্রণা থেকে মুক্ত।

৫০

মহসিন বলতেই মাওলানা মহসিনের দেওয়া বইয়ের কথা স্মরণ হয় সাবিনার। এক দৌড়ে ঘরে চলে যায় সে। বইটা হাতে নিয়ে পরম শ্রদ্ধায় বইয়ের গায়ে চুমু খায়। বুকে জড়িয়ে নেয় অমূল্যধন। হবু স্বামীর দেওয়া উপহার বলে কথা। বড় যত্ন সহকারে বইটা পড়তে শুরু করে সাবিনা। কয়েক পাতা পড়ার পরই মাওলানা মহসিনের দেওয়া চিরকুটে নজর পড়ে তার। কল্পনাও করেনি বইয়ের মধ্যে আরও কিছু থাকতে পারে। তাড়াহুড়া করে চিরকুটটি খোলে সাবিনা।

'প্রিয়তমা সাবিনা। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছ। মনে আত্মবিশ্বাস নিয়ে তোমাদের বাড়িতে ঢুকেছিলাম। তুমি আমার স্বপ্নের রানী হবে, তোমাকে দেখে আমার পছন্দ হবে- এই ভেবে। এই চিঠি যদি হাতে পাও, মনে করবে সত্যিই তোমাকে আমার অনেক অনেক পছন্দ হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে সবসময় বলেছি, আমার সংসারে সঙ্গী হয়ে যে আসবে, সংসার গোছাতে আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে- আমার ঘর যে আলোতে ভরে দেবে, সে যেন আমার অপূর্ণতা পূর্ণ করে দেয়। আমার খালি জায়গাটা ভরিয়ে দেয়।

আমি তোমাকে নিয়ে নতুন করে আমার জীবন সাজাব। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংসার হবে আমাদের ইনশাআল্লাহ। তবে আমি তোমার চাহিদার খবর জানি না। আমরা খুব গরিব। ছোটবেলায় বাবা হারিয়েছি। ভাইরা কোনোমতে টেনেটুনে সংসার চালান।

আমি মাদরাসার বোর্ডিংয়ে থেকে লেখাপড়া করেছি। এখন সামান্য একটা খেদমত করি। মাদরাসায় পড়াই সামান্য বেতনে। সাংসারিক অভাব অনটন কবে ঘোচবে জানি না। তুমি যদি সুখ-দুঃখে আমার পাশে থাকো তাহলে কোনো প্রতিকূলতা মাথায় নেবো না। আমি এও বিশ্বাস করি, আমাদের ধৈর্য থাকলে প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে পারব ইনশাআল্লাহ। অচিরেই তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে স্বপ্নের বাসরঘরে। তুমি আমার, আর আমি তোমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকব ততদিন। ইতি মহসিন।'

সাবিনা চিঠি পড়ে আনন্দ আর ধরে রাখতে পারে না। মন ব্যাকুল হয়ে

ওঠে মহসিনকে কখন কাছে পাবে।
এটাই পবিত্র ভালোবাসার বন্ধন। বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে যে ভালোবাসার বন্ধন তৈরি হয়, সে ভালোবাসা নির্মল, সে ভালোবাসায় নেই কোনো স্বার্থ, নেই কোনো মিথ্যা। আছে শুধুই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। নির্মল ও পবিত্র এই বন্ধনে যে সুখ আছে- তা বিবাহপূর্ব প্রেম-পিরিতির মাঝে নেই। বিবাহপূর্ব প্রেমে রয়েছে স্বার্থ, যৌনাকাঙ্ক্ষা ও অপবিত্র চাহিদা। এর বাইরে কিছু নয়।

৫১

দু'দিন কলেজে যায় না মাহিন। তিনদিন পর গিয়েছে, কিন্তু সঙ্গে বইয়ের ব্যাগ নেই! ক্লাসরুমেও ঢোকেনি মাহিন। সরাসরি প্রিন্সিপাল রুমে চলে যায় সে। মাসনা থরথর করে কাঁপে। 'মাহিন কি আমার নামে নালিশ করতে যাচ্ছে! আমার লেখা চিঠি প্রিন্সিপালকে দেবে না তো? তাহলে যা ভেবেছি তা কি ভুল! আমার প্রতি মাহিনের কোনো টান নেই!' ইতোমধ্যে মাহিন প্রিন্সিপালের রুম থেকে বেরিয়েও যায়। বেরিয়ে সোজা বাড়ির পথ ধরে সে।
ক্লাস শেষে চৈতিকে সব খুলে বলে মাসনা। চৈতি বলে– চিন্তার কারণ নেই। আমি দেখছি কী করা যায়।
চৈতি বিকেলে সরাসরি মাহিনের বাড়ি চলে যায়। দেখে মাহিনদের বাড়িতে সাজসাজ অবস্থা। বাড়ির রাস্তার দুইধারের গাছের নিচের দিক সাদা চুনায় আবৃত। ফুলগাছগুলো নতুন করে পরিচর্যা করছে মাহিন নিজেই। পানি দিয়ে ময়লা ধুয়ে দিচ্ছে। আরও কত কী।
চৈতি সরাসরি মাহিনের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়– ভালো আছেন মাহিন ভাই!
–এইতো আছি। দেখছিস না ব্যস্ততায় সময় পার করছি!
মাহিন কাজের মাঝে এতটাই ডুবেছিল, কার সঙ্গে কথা বলছে তাও খেয়াল নেই। পেছন ফিরে তাকাতেই চমকে ওঠে মাহিন– ওহ! চৈতি এসেছিস! এসেছিস ভালোই হয়েছে।
চৈতি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই মাহিন বলতে শুরু করে– তিনদিন ধরে ক্লাসে যেতে পারিনি। জানিস তো আমাদের সাবিনার বিয়ে। আজ

কলেজে গিয়ে প্রিন্সিপাল স্যার থেকে আরও তিনদিনের ছুটি নিয়ে এসেছি।

মাহিনের মুখে এসব কথা শুনে মুহূর্তেই পাহাড়সম ওজন পড়ে যায় চৈতির মাথা থেকে।

–ও আচ্ছা! তাহলে এই কাহিনী!

–কেন কিছু হয়েছে নাকি?

জিজ্ঞেস করে মাহিন।

–আপনার জানেমান মাসনা তো পুরা বেহুশ। ও মনে করেছে আপনি প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ দিতে গিয়েছিলেন।

মাহিন হেসে উঠে বলে– পাগল নাকি! ওর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও নালিশ দেবো কেন? আমি এমনিই সাবিনার বিয়ের দাওয়াত নিয়ে তোদের কাছে যেতাম। হাতের কাজটা সেরে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। তুই এসেছিস ভালো হয়েছে। আগামীকাল আমাদের সাবিনার বিয়ে। তোরা অবশ্যই থাকবি কিন্তু!

–মাসনার ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন মাহিন ভাই?

–সাবিনার বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত আমি। এই সময়ে অন্যকিছু ভাবার সুযোগ কোথায়! কাল দুপুরে আমাদের বাড়িতে চলে আসবি তোরা। বিকেলে বড়মসজিদে সাবিনার আকদ। রাতেই বরপক্ষ বাড়িতে আসবে।

–আচ্ছা ঠিক আছে, অবশ্যই কাল আসব।

চলে যায় চৈতি।

৫২

দেখতে দেখতে তিনদিন চলে যায়। আজ সবিনার বিয়ে। মসজিদের ইমাম সাহেবকে এ বিষয়ে আগেই বলে রাখেন মাহিনের বাবা জমির উদ্দীন। মাওলানা মহসিন তার ভাইদের নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হন বাজার মসজিদে। জাহিদুলও আসে বরপক্ষের সঙ্গে।

অনুমতি নিতে সাবিনার ঘরে ঢোকেন জমির উদ্দীন। সাবিনা মাথা নিচু করে বসে থাকে। সাবিনার পাশে আমেনা বেগমও আছেন। বাবা ঘরে ঢুকতেই সাবিনা বাবাকে জড়িয়ে কেঁদে ফেলে। তোমাদের ছেড়ে

কীভাবে থাকব বাবা। কতটা বছর তোমাদের সঙ্গে থেকেছি। অজানা-অচেনা পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারব তো!

আমেনা বেগমও খাটের ওপর বসে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছেন। কাঁদেন জমির উদ্দীনও। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে বোবা কান্নায় বুক ফেটে যায় মাহিনের। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে সাবিনার ঘরে ঢুকে– "বাবা সময় পেরিয়ে যায়, বরপক্ষ এসে অপেক্ষা করছে।" বলে সবার মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরাবার চেষ্টা করে সে। জমির উদ্দীন অনুমতি চান সাবিনার কাছে।

সাবিনা বাবার অনুমতির জবাবে বলে– তোমাদের সঙ্গে অনেকসময় দুর্ব্যবহার করেছি, তোমরা ক্ষমা করে দিও বাবা। দোয়া করো আমি যেন সাংসারিক জীবনে সুখী হতে পারি। ভাইয়া তোকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা করে দিস।

মাহিনকে লক্ষ্য করে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে সাবিনা। এবার মাহিনও নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে মাহিন। ভাই বলে কথা। প্রত্যেক ভাই-ই বোনদের নিরাপত্তা, আদর, সম্মান ও ভালোবাসার চাদরে আগলে রাখে জীবনের শেষ অবধি।

মাহিন জবাবে কোনোকিছু বলার ভাষা হারিয়ে ফেলে। সাবিনার হাত ধরে শুধু কেঁদেই যায় মাহিন। কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে বলে– তোকে ছেড়ে আমি কী করে থাকব। আমি কাকে শাসন করে বলব- ভাত দে! কার সঙ্গে খুনসুটি করব আমি। মার্কেটে গেলেই সবার আগে তোর পছন্দের জিনিসটা সংগ্রহ করেছি। আজ কতদূরে চলে যাচ্ছিস। তোর ঘরটা ফাঁকা পড়ে থাকবে।

আমেনা বেগম বলেন– তোদের দুজনের দুষ্টুমিতে ঘরটা সবসময় জাগ্রত থাকত। সাবিনা চলে গেলে ঘরটা কবরে পরিণত হবে। আমি সাবিনার জামাইকে অনুরোধ জানাব, যেন একটাবছর অন্তত ওকে আমাদের বাড়িতে রেখে দেয়।

একটি আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয় সাবিনার ঘরে। বাবা জমির উদ্দীন সাবিনার অনুমতি নিয়ে বের হন। মাহিন ও বড়ছেলে রাশেদকে সঙ্গে করে কেন্দ্রীয় মসজিদে চলে যান তিনি। মাহিনদের খবর পেয়ে কনেপক্ষকে রিসিভ করে জাহিদুল। আসর নামায শেষে যথারীতি সুন্নত তরীকায় আকদ সম্পন্ন করেন মসজিদের ইমাম সাহেব।

বিয়ে শেষে মাহিনের বাবা জমির উদ্দীন দাঁড়িয়ে আবেগভরা কণ্ঠে বলেন– আমার মেয়ের জন্য সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ যেন ওদের সংসার সুখে পরিপূর্ণ করে দেন।

৫৩

পরদিন দুপুরে মাহিনদের বাড়ি উপস্থিত হয় মাসনা ও চৈতি। মাসনা আজ একটু বেশিই সেজেছে।

চৈতি বলে– বিয়ে তোর নাকি সাবিনার? যেভাবে সেজেছিস তাতে তো মনে হচ্ছে আজ তোরই বিয়ে!

–বিয়ে বাড়িতে এসেছি। একটু সাজগোজ না করলে হয় নাকি?

মাসনা মুখে যাই বলুক, সে মূলত মাহিনের জন্যই সেজেছে আজ।

কোনো পরপুরুষের নজর কাড়তে নারীদের অলঙ্কার পরা, সাজগোজ করা, সুগন্ধি লাগানো হারাম। কিন্তু বর্তমান সময়ের মেয়েরা এগুলোই বেশি করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেয়েদের সাজসজ্জা দেখে মনে হয়- প্রত্যেকেই বিয়ের জন্য সেজেছে!

রাষ্ট্রীয় দিবসগুলোতেও মেয়েদের চাল-চলন, সাজগোজ, পোশাক-পরিচ্ছেদ নিয়ে প্রশ্নের তৈরি হয়। অনেকের বডিল্যাঙ্গুয়েজও আবেদনময়ী! ধর্ষণ আর ইভটিজিংয়ের জন্য মেয়েদের এসব চাল–চলনকে দায়ী করলে অযৌক্তিক হবে না।

যদিও অনেকে বলে, নারীদের চাল-চলনে দোষ নেই, দোষ পুরুষের দৃষ্টি ও মনে। তাদের যুক্তি একেবারেই শিশুসূলভ। কেননা, প্রত্যেক কাজ ও ব্যবহারের উপযুক্ত জায়গা আছে। উপযুক্ত জায়গা ব্যতিত কোনোকিছু করলে তাতে সমস্যার সৃষ্টি হবেই। যেমন সন্তান জন্ম দেওয়ার জায়গা খোলা পরিবেশ নয়, ঘরোয়া পরিবেশে সন্তান জন্ম দিতে হয়।

তেমনই ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ ঘরোয়া পরিবেশ নয়, খোলা পরিবেশে ব্যবসা করতে হয়। ঘরোয়া পরিবেশে কেউ ব্যবসা করলে যেমন সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়, তেমনই কোনো নারী যদি রাস্তার

খোলা পরিবেশে সন্তান জন্ম দেয়, তাহলে সেই নারীর প্রতিও চারিত্রিক প্রশ্ন তোলবে সবাই।

মেয়েদের জন্য খোলা পোশাকে চলাফেরা করা শোভনীয় নয়। নারী অনেক দামী জিনিস। যত্রতত্র যেভাবে সেভাবে তাদের চলাফেরা আল্লাহ পছন্দ করেন না। তাদের চলাফেরায় থাকবে শালীনতা ও বিনয়।

স্ত্রীকে ব্যবহার করার অধিকার থাকলেই যেমন যেখানে সেখানে ব্যবহার করা যায় না, ঠিক তেমনই প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীনতা থাকলেই যেখানে সেখানে চরিত্র প্রকাশ করা যায় না। পোশাক যদি দোষের না-ই হয়, তাহলে পর্দাবৃত কোনো নারী ধর্ষণের শিকার হন না কেন? হাজারে দুই-একজন পাওয়াও মুশকিল।

৫৪

অনেকের অভিযোগ– ইসলামপন্থীরা নারীদের চারদেয়ালে আবদ্ধ করে রাখে। নারীদের প্রতিভা বিকাশে ইসলামপন্থীরা প্রধান প্রতিবন্ধক। কিন্তু অভিযোগকারীরা চারদেয়ালে থাকা সেই পর্দানশীন নারীদের মতামত গ্রহণ করেনি কোনোদিন! নিজেদের খেয়ালখুশি মন্তব্য করে যাচ্ছে। পর্দানশীন নারী থেকে জরিপ করা জরুরি- তারা কি আসলেই পর্দায় থাকাটাকে চারদেয়ালে বন্দি মনে করেন কী না। অথবা স্বামী ভাই কিংবা বাবার ভয়ে বাধ্য হয়ে চারদেয়ালে আছেন কী না। তখনই প্রমাণ হবে কথিত প্রগতিশীলদের অভিযোগের সত্যতা কতটুকু।

বাস্তবতা হলো- পর্দানশীন নারীরা সুখেই আছেন। সাংসারিক সুখ-শান্তি ও স্বামী-সন্তানকে সঠিক পরিচর্যা করা এবং সংসারটাকে গুছিয়ে রাখার মাঝেই নারীদের নারীসুলভ প্রতিভা প্রকাশ পায়।

পর্দনশীন নারীরা ঐ চারদেয়ালকেই দুনিয়ার জান্নাত মনে করেন। বাহির জগৎটাকে মনে করেন জাহান্নাম। কেউ চাইলেও তাদেরকে বাইরে বের করতে পারবে না। যারা অভিযোগ করে– নারীরা চারদেয়ালে বন্দী, তাদের অভিযোগের মৌলিক কোনো ভিত্তি নেই।

নারীদের মূল বসবাসের জায়গা পর্দা। তারা যদি বাইরে যেতে চান, শপিং করতে চান, এমনকি চাকরিও করতে চান, ইসলাম তাতে বাধা

দেয় না। তবে শর্ত হলো- নারীর সম্মান রক্ষায় নিরাপদ পরিবেশ বাধ্যতামূলক। নিরাপদ পরিবেশ না থাকলে নারীরা বাইরে বেরোলে যৌন হয়রানির শঙ্কা থেকেই যায়। নারী বাইরে বের হবে, তবে পর্দার সঙ্গে এবং নারীবান্ধব পরিবেশ পেলে। তার আগে নয়। এই শর্ত দুটি মানতে পারলে নারী বাইরের যেকোনো কাজে নিজেকে শামিল করতে অসুবিধা নেই।

৫৫

আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীকে দুইটি পরিবেশে ভাগ করেছেন; একটি হলো খোলা পরিবেশ, আরেকটি ঘরোয়া। ঘরোয়া পরিবেশের উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন নারী এবং খোলা পরিবেশের উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ। খোলা পরিবেশের সকল কাজ পুরুষের জন্য প্রযোজ্য। তেমনই ঘরোয়া পরিবেশের কাজ নারীর জন্য প্রযোজ্য।

হাল চাষ করা, নদীতে মাছ ধরা, রাষ্ট্র পরিচালনা করা, দোকানদারী করা, এগুলো পুরুষের কাজ। দোকানদারকে কেউ যদি বলে– "ঐ পুরুষ লোকটা দোকানের বেষ্টনীতে আবদ্ধ রয়েছে, তাকে মুক্ত করা দরকার।" এ কথা যেমন ভুল, নারী পর্দায় থাকলে চারদেয়ালে বন্দী বলাও তেমন ভুল। কেননা, দোকান যেমন পুরুষ লোকটির কর্মস্থল, ঠিক নারীর জন্যও ঘরোয়া পরিবেশ তার কর্মস্থল।

ঘরোয়া পরিবেশের জন্য নারীদের আল্লাহ এমন উপযুক্ত করে সৃষ্টি করে বানিয়েছেন- পুরুষ চাইলেও ঘরোয়া পরিবেশের অনেক কাজ করতে পারবে না। যেমন সন্তান জন্ম দেওয়া, সন্তানকে দুধ পান করানো, সন্তান গর্ভে ধারণ করা, এগুলো নারীর কাজ। আর এগুলো ঘরোয়া পরিবেশেই হতে হবে। যারা সমান অধিকারের কথা বলে, তারা কি পারবে পুরুষের পেটে বাচ্চা দিতে? নারীকে দিয়ে ট্রাকের ড্রাইভারি করাতে? সম্ভব নয়। তাহলে সমান অধিকার জীবনেও সম্ভব নয়। অতএব, আল্লাহর বিধান পর্দা ও রাসূলে কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শই নারীদের আসল মর্যাদার মাপকাঠি।

মাছ যেমন পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না, তেমনি পর্দা ছাড়া নারীর সম্মান

টেকে না। পানি ছেড়ে স্থলে চলে এলে মাছ যেমন কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যায়; নারীও পর্দা ছেড়ে বেরিয়ে এলে তার কদরও মর্যাদা কমে যায়।

বিড়ালের সামনে মাছ রেখে যতই বয়ান দেওয়া হোক না কেন, বিড়াল যেমন মানে না- নারীদের বেপর্দায় ছেড়ে বখাটে যুবকদের যতই বয়ান দেওয়া হোক না কেন, ঐ যুবকরাও তা মানবে না।

সমাজের সবাই সভ্য-ভদ্র নয়; উচ্ছৃঙ্খল ইভটিজার ও বখাটের উৎপাত রয়েছে প্রচুর। সেগুলো মাথায় রেখে নারী নিজ সম্মানের কথা ভেবে চলতে পারলে, ধর্ষণ ইভটিজিং ও যৌন হয়রানি কিছুটা হলেও কমে যাবে।

৫৬

অনেকে ওলামায়ে কেরামকে নারী উন্নতির প্রধান বাধা মনে করেন! অথচ বর্বর জাতির সেই যুগ- যে যুগে নারীর ছিল না কোনো সম্মান, ছিল না মর্যাদা, ছিল না অধিকার। নারী নিজেই জানত না তাদের সম্মান আছে, আছে মর্যাদা। তারা জানত ঐটাই নারীর জীবন, যে অভিশাপের জীবন তারা বয়ে বেড়াত।

কন্যাসন্তান জন্ম নিলে জীবন্ত দাফন করা হতো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শের মাধ্যমে সেই জাহেলী অন্ধকার যুগ দূর হয়ে নির্মল আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে। নারী জাতি প্রথম জানতে পারে তাদেরও সমাজে সম্মান আছে, অধিকার আছে, আছে মর্যাদা। তারা জানতে পারে- নারীদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। নারীর পায়ের নিচে বেহেশত। ক'দিন আগেও যেখানে নারীরা রাস্তায় হাঁটতে পারেনি, ছিল না ইজ্জতের নিরাপত্তা, সেখানে রাসূল সা.-এর আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী জাতি মুক্তি লাভ করে বর্বরদের দাসত্ব থেকে।

আমাবস্যার রাতে সুন্দরী যুবতী একা চলতেও সম্ভ্রম হারাবার শঙ্কা করেনি।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিনিধিত্ব করছেন ওলামায়ে কেরাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম-এর সেই আদর্শ বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর ওলামায়ে কেরাম। সেই ওলামায়ে কেরাম নারীদের প্রধান বাধা! এটাও কি বিশ্বাস করতে হবে? বরং ওলামায়ে কেরাম সবসময়, সর্বাবস্থায় নারীর ইজ্জত, মর্যাদা ও সম্মানের জন্য লড়াই করে গেছেন। এখনও লিখে যাচ্ছেন, বলে যাচ্ছেন।

মূলত নারীর ইজ্জত নিয়ে তামাশা করছে তারা- যারা অধিকারের নামে নারীদের রাস্তায় নামিয়ে অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দিয়েছে। তারা প্রতিনিয়ত পণ্য হিসেবে ব্যবহার করছে নারীদের। অধিকারের নাম দিয়ে নারীদের উপভোগের সামগ্রী বানিয়েছে। যেদিন থেকে নারী অধিকারের দাবি নিয়ে নারীদের রাস্তায় নামিয়ে ফ্রি মাইন্ডের সংস্কৃতি চালু করা হয়েছে- সেদিন থেকে দেশে ধর্ষণ, ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা, যৌন হয়রানি ও ইভটিজিং ব্যাপকহারে বাড়তে শুরু করেছে।

৫৭

নতুন মেহমান নিয়ে বাড়ি ফেরে মাহিন। চারিদিকে সাজসাজ রব। আনন্দঘন পরিবেশ। সবকিছু গোছালো-পরিপাটি। মাওলানা মহসিনের মনে অন্যরকম এক অনুভূতি কাজ করে। সাবিনার মতো একটি শান্ত মেয়ে তার জীবনসঙ্গিনী হয়েছে। কিছুক্ষণ আগেও যাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না- তারা এখন পরম আত্মীয়। যাদের সুখ-দুঃখে মাওলানা মহসিনের কিছুই আসত যেত না, সময়ের ব্যবধানে সেই তাদের সুখ-দুঃখ নিয়ে ইতোমধ্যেই ভাবতে শুরু করেন তিনি।

এদিকে সবাই অপেক্ষামাণ নতুন মেহমানের জন্য। নানা ধরনের আয়োজন প্রস্তুত। পিঠা-পুলি, নাস্তা-শরবৎ, কোরমা-পোলাও আরও কত কী! নতুন জামাই বলে কথা। আমেনা বেগম চারদিকটায় খেয়াল রাখেন কোনো ধরনের ত্রুটি যাতে না হয়। এলাকার গণ্যমান্য মুরুব্বীরা সবাই মাহিনদের বাড়িতে। জমির উদ্দীন আগেই সবাইকে দাওয়াত করেছেন।

উপস্থিত মজলিসে সালাম দিয়ে প্রবেশ করেন মাওলানা মহসিন। আলোচনা হয় লম্বা সময় ধরে। মাওলানা মহসিনকে দেখে সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নতুন জামাই'র কথাবার্তায়ও সবাই খুশি।

প্রত্যেক এলাকায় কিছু অতিচালাক মানুষ থাকে। যারা পরিবেশ না বুঝেই হট্টগোল লাগাতে ওস্তাদ। তারা নিজেকে সবজান্তা মনে করে। মাহিনদের বাড়িতেও সেদিন এলাকার এক অতিচালাক কিছু দোপেয় পিশাচ উপস্থিত হয়। কাউকে অপমান করা, প্রশ্ন করে ঠেকিয়ে দেওয়া, অন্যকে হেয় করে কথা বলাই তাদের কাজ। হয়ত এতেই তাদের আনন্দ।

চালাক লোকটা মাওলানা মহসিনের কাছে প্রশ্ন করে– মাওলানা সাহেব! মেয়ের বাবা গরিব মানুষ, মেয়ের বাড়িতে এতবড় আয়োজন করা কি ঠিক? আপনি একজন মাওলানা মানুষ হয়ে এটা কীভাবে গ্রহণ করলেন?

চালাক লোকটা মাওলানা মহসিনকে সবার সামনে অপমান করার পরোক্ষ চেষ্টায় মেতে ওঠে। উপস্থিত সবাই লোকটার ওপর ভীষণ রেগে যান। কিন্তু তাতে তার কিছুই যায় আসে না।

মাওলানা মহসিন দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন– ওনার সঙ্গে রাগ করবেন না। ওনার জবাব আমি দিচ্ছি। মেয়ের বাড়িতে মেয়ের বাবা সামর্থ অনুযায়ী কিছু আয়োজন করলে সেটা মেয়ের বাবার একান্ত ব্যক্তিগত চাহিদা। মেয়ের বাবাকে ছেলের বাড়ি থেকে যদি চাপ প্রয়োগ করা হয়, আমাদের এতজন খাওয়াতেই হবে, সেটা ইসলাম সমর্থন করে না। এ বাড়িতে এতবড় আয়োজন এটা আমি জানিনি এবং এই সামার্থ আমার শ্বশুরের আছে কী না সেটাও আমি জানি না। তবে আমাদের পক্ষ থেকে ন্যূনতম চাপ প্রয়োগ করা হয়নি।

আমার শ্বশুর সামার্থ অনুযায়ী আয়োজন করেছেন বলেই আমি বিশ্বাস করি। তা ছাড়াও এটা তার ও তার পরিবারের একান্ত পারিবারিক ব্যাপার। সেখানে আমাদের বাড়তি কথা বলা বা অধিকার ফলানো কতোটা ভদ্রতা! তা হিসাব করা উচিৎ।

মাওলানা মহসিনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জাহিদুল বলে– এই আয়োজন সম্পূর্ণ সাধ্যের মধ্যেই হয়েছে। কারণ আমার বন্ধু মাহিন তার একমাত্র বোনের বিয়ের জন্য ওর নিজের জমানো টাকা দিয়ে সব আয়োজন করেছে। একটিমাত্র বোন, বোনের বিয়েতে আরও বেশি কিছু করা উচিৎ।

৫৮
আসরের পরপর চৈতি ও মাসনাসহ প্রতিবেশী মহিলারা মিলে সাবিনাকে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাড়িতে আনন্দের ঢেউ। সাবিনাকে সাজানো শেষে বাসরঘর সাজানোর দায়িত্ব আসে মাসনার ওপর। মাসনা বাসরঘর সাজাতে শুরু করে। চৈতি রহস্যচ্ছলে বলে– অন্যের বাসর সাজিয়ে দিচ্ছিস, নিজের বাসার কবে?
–চৈতির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সাবিনা বলে, আমি সাজাব মাসনা আপুর বাসর। এভাবে হাসি-আনন্দের মাঝেই বাসর সাজানোর কাজ শেষ হয়। এক পর্যায়ে চৈতি সাবিনাকে জিজ্ঞেস করে– তোর বর কেমন রে সাবিনা?
–জানি না। তবে কথাবার্তায় মনে হয়েছে একজন মহৎ মানুষ। মাহিন ভাইয়া ও বাবা বলেছেন সে নাকি খুব ভালো।
–বাপরে! বিয়ে হতে না হতেই এত প্রশংসা!
মাসনাকে টিপ্পনী কেটে বলে চৈতি।
সাবিনা বুঝতে পারে, চৈতি ওকে ক্ষেপানোর জন্য ইচ্ছে করেই খোঁচাচ্ছে। তাই মুখ খোলে– ভালো একজন মানুষ আমার জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছি। তোমরা আমার জন্য দোয়া করো, তাকে নিয়ে যেন সুখের ঘর বাঁধতে পারি। আমার বিশ্বাস তিনি আমাকে সুখে রাখবেন ইনশাআল্লাহ।

আলেমরা কখনও স্ত্রীর হক নষ্ট করেন না। স্ত্রীর সমস্ত প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দেন। অত্যাচার, পরকীয়া এগুলোর সঙ্গে কোনো সম্পৃক্ততা নেই তাদের। এজন্য আলেমদের যত পরিবার আছে, প্রত্যেক পরিবারে সুখের সুবাতাস বয়।
জীবনে চাওয়া-পাওয়া ছিল একজন আলেমের স্ত্রী হওয়া। আল্লাহ অন্তরের আকূতি কবুল করেছেন। এবার আমার জন্য ভবিষ্যৎ জীবনটা চ্যালেঞ্জের। পাশাপাশি উপভোগেরও। তবে সাংসারিক জীবনে কেউ যদি সুখী হতে চায়, তবে দীনি পরিবেশের বিকল্প নেই।
সাবিনার কথায় মুগ্ধ চৈতি ও মাসনা। সাবিনার সুখের জন্য শুভকামনা করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মাসনা ও চৈতি।

মাসনা অপেক্ষা করে মাহিনের সঙ্গে কখন দেখা হবে। মাহিনের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করবে। আজই সুবর্ণ সুযোগ মাহিনকে কাছে পাওয়ার। বিয়ে বাড়ি। সবাই আনন্দ ফূর্তি আর হাসি-ঠাট্টায় ব্যস্ত থাকবে, সেই সুযোগে মাহিনের কাছে গেলে কেউ সন্দেহ করবে না।

বর্তমান সময় বিয়ে বাড়িতে প্রচুর শরীয়তবিরোধী, সমাজবিরোধী কাজ হয়ে থাকে। কোনো কোনো বিয়েতে আপোষের যৌনতাও সংঘটিত হয়! বিয়ে বাড়িতে কেউ কাউকে বাধা দেয় না। হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে পুরুষ মহিলাকে স্পর্শ করে, মহিলা পুরুষকে স্পর্শ করে! গান-বাজনা করে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। প্রচুর খাবার-দাবার নষ্ট করে। অনেক অপচয় হয় বিয়ে বাড়িতে। শরীয়ত সম্মতভাবে বিয়ের আয়োজন হলে, এসব থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৫৯

রাতের আপ্যায়ন শেষে মাসনা ও চৈতি সাবিনাকে নতুন বধু সাজিয়ে, বাসরঘরে রেখে দরজার মাঝে কিছু ফিতা দিয়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে! মাওলানা মহসিন ঢুকতে হলে ফিতা কেটে তবেই ঢুকতে হবে। সেই সুযোগে নতুন দুলার কাছে চাঁদা দাবি করবে মাসনা ও চৈতি!

রাত গভীর হয়। অতিথিরাও আস্তে আস্তে বিদায় নেয়। প্রতিবেশী মহিলারা বরকে বাসরঘরে পাঠাবার তাগিদ দেয়।

মাওলানা মহসিনকে নিয়ে বাসরঘরের দিকে রওয়ানা হয় মাহিন। মাওলানা মহসিনের মাঝে কেমন একটা ভয় ভয় কাজ করে। যারা বিবাহপূর্ব অবৈধ সম্পর্কে জড়ান না, তাদের জন্য বাসরঘর যেমন আনন্দের তেমন ভয়েরও। কৌতুহলেরও শেষ থাকে না। সে হোক ছেলে কিংবা মেয়ে। মাওলানা মহসিনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জীবনের প্রথম কোনো মেয়ের পাশে বসবেন। এর আগে কোনোদিন কোনো মেয়ের পরশ পাননি মাওলানা মহসিন।

ওদিকে সাবিনাও ভয়ে থরথর করে কাঁপে। কী হবে! জীবনে কোনো পুরুষের ছোঁয়া লাগেনি সাবিনার গায়। আল্লাহর কাছে যেমন স্বামী

চেয়েছে, তেমন স্বামী পেয়েছে। এ আনন্দেও বাসররাতের সেই অচেনা পরিবেশের ভয়টা কাজ করে তার মাঝে।

একেবারে বাসরঘরের সামনে চলে যান মাওলানা মহসিন। সঙ্গে আছে মাহিনও।

–সে কী! দরজায় প্রতিবন্ধকতা কেন? জিজ্ঞেস করে মাহিন।

–চৈতি সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, নতুন দুলাভাইকে কিছু বখশিশ দিতে হবে। না দিয়ে বাসরঘরে ঢুকতে পারবেন না। আমরা রাস্তায় গেট করতাম, কিন্তু সেটা করতে দেওয়া হয়নি। সেখান থেকে মোটা অঙ্কের কিছু আদায় করার ধান্দা ছিল। সেটা যেহেতু পারিনি, সেহেতু এখানে ছাড় হবে না।

চৈতি ও মাসনা; ওরা দু'জন আমার ক্লাসমেট। শালি হিসেবে ওরা দুলাভাইর সঙ্গে একটু মশকরা করছে; মাওলানা মহসিনকে বলে মাহিন।

মাওলানা মহসিন বলেন– দেখুন! দুলাভাইর সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক শালিদের কোনো ধরণের খুনসুটি জায়েয নেই; হারাম।

৫৭

নতুন মেহমান নিয়ে বাড়ি ফেরে মাহিন। চারিদিকে সাজসাজ রব। আনন্দঘন পরিবেশ। সবকিছু গোছালো-পরিপাটি। মাওলানা মহসিনের মনে অন্যরকম এক অনুভূতি কাজ করে। সাবিনার মতো একটি শান্ত মেয়ে তার জীবনসঙ্গিনী হয়েছে। কিছুক্ষণ আগেও যাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না- তারা এখন পরম আত্মীয়। যাদের সুখ-দুঃখে মাওলানা মহসিনের কিছুই আসত যেত না, সময়ের ব্যবধানে সেই তাদের সুখ-দুঃখ নিয়ে ইতোমধ্যেই ভাবতে শুরু করেন তিনি।

এদিকে সবাই অপেক্ষামাণ নতুন মেহমানের জন্য। নানা ধরনের আয়োজন প্রস্তুত। পিঠা-পুলি, নাস্তা-শরবৎ, কোরমা-পোলাও আরও কত কী! নতুন জামাই বলে কথা। আমেনা বেগম চারদিকটায় খেয়াল রাখেন কোনো ধরনের ত্রুটি যাতে না হয়। এলাকার গণ্যমান্য মুরুব্বীরা সবাই মাহিনদের বাড়িতে। জমির উদ্দীন আগেই সবাইকে দাওয়াত

করেছেন।
উপস্থিত মজলিসে সালাম দিয়ে প্রবেশ করেন মাওলানা মহসিন। আলোচনা হয় লম্বা সময় ধরে। মাওলানা মহসিনকে দেখে সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নতুন জামাই'র কথাবার্তায়ও সবাই খুশি।
প্রত্যেক এলাকায় কিছু অতিচালাক মানুষ থাকে। যারা পরিবেশ না বুঝেই হট্টগোল লাগাতে ওস্তাদ। তারা নিজেকে সবজান্তা মনে করে। মাহিনদের বাড়িতেও সেদিন এলাকার এক অতিচালাক কিছু দোপেয় পিশাচ উপস্থিত হয়। কাউকে অপমান করা, প্রশ্ন করে ঠেকিয়ে দেওয়া, অন্যকে হেয় করে কথা বলাই তাদের কাজ। হয়ত এতেই তাদের আনন্দ।
চালাক লোকটা মাওলানা মহসিনের কাছে প্রশ্ন করে– মাওলানা সাহেব! মেয়ের বাবা গরিব মানুষ, মেয়ের বাড়িতে এতবড় আয়োজন করা কি ঠিক? আপনি একজন মাওলানা মানুষ হয়ে এটা কীভাবে গ্রহণ করলেন?
চালাক লোকটা মাওলানা মহসিনকে সবার সামনে অপমান করার পরোক্ষ চেষ্টায় মেতে ওঠে। উপস্থিত সবাই লোকটার ওপর ভীষণ রেগে যান। কিন্তু তাতে তার কিছুই যায় আসে না।
মাওলানা মহসিন দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন– ওনার সঙ্গে রাগ করবেন না। ওনার জবাব আমি দিচ্ছি। মেয়ের বাড়িতে মেয়ের বাবা সামর্থ অনুযায়ী কিছু আয়োজন করলে সেটা মেয়ের বাবার একান্ত ব্যক্তিগত চাহিদা। মেয়ের বাবাকে ছেলের বাড়ি থেকে যদি চাপ প্রয়োগ করা হয়, আমাদের এতজন খাওয়াতেই হবে, সেটা ইসলাম সমর্থন করে না। এ বাড়িতে এতবড় আয়োজন এটা আমি জানিনি এবং এই সামার্থ আমার শ্বশুরের আছে কী না সেটাও আমি জানি না। তবে আমাদের পক্ষ থেকে ন্যূনতম চাপ প্রয়োগ করা হয়নি।
আমার শ্বশুর সামার্থ অনুযায়ী আয়োজন করেছেন বলেই আমি বিশ্বাস করি। তা ছাড়াও এটা তার ও তার পরিবারের একান্ত পারিবারিক ব্যাপার। সেখানে আমাদের বাড়তি কথা বলা বা অধিকার ফলানো কতোটা ভদ্রতা! তা হিসাব করা উচিৎ।
মাওলানা মহসিনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জাহিদুল বলে– এই আয়োজন সম্পূর্ণ সাধ্যের মধ্যেই হয়েছে। কারণ আমার বন্ধু মাহিন তার একমাত্র বোনের বিয়ের জন্য ওর নিজের জমানো টাকা দিয়ে সব

আয়োজন করেছে। একটিমাত্র বোন, বোনের বিয়েতে আরও বেশি কিছু করা উচিৎ।

৫৮

আসরের পরপর চৈতি ও মাসনাসহ প্রতিবেশী মহিলারা মিলে সাবিনাকে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাড়িতে আনন্দের ঢেউ। সাবিনাকে সাজানো শেষে বাসরঘর সাজানোর দায়িত্ব আসে মাসনার ওপর। মাসনা বাসরঘর সাজাতে শুরু করে। চৈতি রহস্যচ্ছলে বলে– অন্যের বাসর সাজিয়ে দিচ্ছিস, নিজের বাসার কবে?

–চৈতির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সাবিনা বলে, আমি সাজাব মাসনা আপুর বাসর। এভাবে হাসি-আনন্দের মাঝেই বাসর সাজানোর কাজ শেষ হয়। এক পর্যায়ে চৈতি সাবিনাকে জিজ্ঞেস করে– তোর বর কেমন রে সাবিনা?

–জানি না। তবে কথাবার্তায় মনে হয়েছে একজন মহৎ মানুষ। মাহিন ভাইয়া ও বাবা বলেছেন সে নাকি খুব ভালো।

–বাপরে! বিয়ে হতে না হতেই এত প্রশংসা!

মাসনাকে টিপ্পনী কেটে বলে চৈতি।

সাবিনা বুঝতে পারে, চৈতি ওকে ক্ষেপানোর জন্য ইচ্ছে করেই খোঁচাচ্ছে। তাই মুখ খোলে– ভালো একজন মানুষ আমার জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছি। তোমরা আমার জন্য দোয়া করো, তাকে নিয়ে যেন সুখের ঘর বাঁধতে পারি। আমার বিশ্বাস তিনি আমাকে সুখে রাখবেন ইনশাআল্লাহ।

আলেমরা কখনও স্ত্রীর হক নষ্ট করেন না। স্ত্রীর সমস্ত প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দেন। অত্যাচার, পরকীয়া এগুলোর সঙ্গে কোনো সম্পৃক্ততা নেই তাদের। এজন্য আলেমদের যত পরিবার আছে, প্রত্যেক পরিবারে সুখের সুবাতাস বয়।

জীবনে চাওয়া-পাওয়া ছিল একজন আলেমের স্ত্রী হওয়া। আল্লাহ অন্তরের আকূতি কবুল করেছেন। এবার আমার জন্য ভবিষ্যৎ জীবনটা

চ্যালেঞ্জের। পাশাপাশি উপভোগেরও। তবে সাংসারিক জীবনে কেউ যদি সুখী হতে চায়, তবে দীনি পরিবেশের বিকল্প নেই।
সাবিনার কথায় মুগ্ধ চৈতি ও মাসনা। সাবিনার সুখের জন্য শুভকামনা করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মাসনা ও চৈতি।
মাসনা অপেক্ষা করে মাহিনের সঙ্গে কখন দেখা হবে। মাহিনের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করবে। আজই সুবর্ণ সুযোগ মাহিনকে কাছে পাওয়ার। বিয়ে বাড়ি। সবাই আনন্দ ফূর্তি আর হাসি-ঠাট্টায় ব্যস্ত থাকবে, সেই সুযোগে মাহিনের কাছে গেলে কেউ সন্দেহ করবে না।

বর্তমান সময় বিয়ে বাড়িতে প্রচুর শরীয়তবিরোধী, সমাজবিরোধী কাজ হয়ে থাকে। কোনো কোনো বিয়েতে আপোষের যৌনতাও সংঘটিত হয়! বিয়ে বাড়িতে কেউ কাউকে বাধা দেয় না। হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে পুরুষ মহিলাকে স্পর্শ করে, মহিলা পুরুষকে স্পর্শ করে! গান-বাজনা করে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। প্রচুর খাবার-দাবার নষ্ট করে। অনেক অপচয় হয় বিয়ে বাড়িতে। শরীয়ত সম্মতভাবে বিয়ের আয়োজন হলে, এসব থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৫৯
রাতের আপ্যায়ন শেষে মাসনা ও চৈতি সাবিনাকে নতুন বধু সাজিয়ে, বাসরঘরে রেখে দরজার মাঝে কিছু ফিতা দিয়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে! মাওলানা মহসিন ঢুকতে হলে ফিতা কেটে তবেই ঢুকতে হবে। সেই সুযোগে নতুন দুলার কাছে চাঁদা দাবি করবে মাসনা ও চৈতি!
রাত গভীর হয়। অতিথিরাও আস্তে আস্তে বিদায় নেয়। প্রতিবেশী মহিলারা বরকে বাসরঘরে পাঠাবার তাগিদ দেয়।
মাওলানা মহসিনকে নিয়ে বাসরঘরের দিকে রওয়ানা হয় মাহিন। মাওলানা মহসিনের মাঝে কেমন একটা ভয় ভয় কাজ করে। যারা বিবাহপূর্ব অবৈধ সম্পর্কে জড়ান না, তাদের জন্য বাসরঘর যেমন আনন্দের তেমন ভয়েরও। কৌতূহলেরও শেষ থাকে না। সে হোক ছেলে কিংবা মেয়ে। মাওলানা মহসিনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

জীবনের প্রথম কোনো মেয়ের পাশে বসবেন। এর আগে কোনোদিন কোনো মেয়ের পরশ পাননি মাওলানা মহসিন।
ওদিকে সাবিনাও ভয়ে থরথর করে কাঁপে। কী হবে! জীবনে কোনো পুরুষের ছোঁয়া লাগেনি সাবিনার গায়। আল্লাহর কাছে যেমন স্বামী চেয়েছে, তেমন স্বামী পেয়েছে। এ আনন্দেও বাসররাতের সেই অচেনা পরিবেশের ভয়টা কাজ করে তার মাঝে।
একেবারে বাসরঘরের সামনে চলে যান মাওলানা মহসিন। সঙ্গে আছে মাহিনও।
–সে কী! দরজায় প্রতিবন্ধকতা কেন? জিজ্ঞেস করে মাহিন।
–চৈতি সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, নতুন দুলাভাইকে কিছু বখশিশ দিতে হবে। না দিয়ে বাসরঘরে ঢুকতে পারবেন না। আমরা রাস্তায় গেট করতাম, কিন্তু সেটা করতে দেওয়া হয়নি। সেখান থেকে মোটা অঙ্কের কিছু আদায় করার ধান্দা ছিল। সেটা যেহেতু পারিনি, সেহেতু এখানে ছাড় হবে না।
চৈতি ও মাসনা; ওরা দু'জন আমার ক্লাসমেট। শালি হিসেবে ওরা দুলাভাইর সঙ্গে একটু মশকরা করছে; মাওলানা মহসিনকে বলে মাহিন।
মাওলানা মহসিন বলেন– দেখুন! দুলাভাইর সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক শালিদের কোনো ধরণের খুনসুটি জায়েয নেই; হারাম।

আমাদের দেশে ফ্রি মাইন্ডের কারণে এই দুলাভাইদের হাতেই বেশি সংখ্যক শালিদের সতীত্ব নষ্ট হয়। এসব ক্ষেত্রে মেয়ের অভিভাবকরাও তেমন গুরুত্বের দৃষ্টি রাখেন না। দেশে একটি প্রচলিত বাক্য আছে-"বিয়ে করলে শালি ফ্রি!" এই বাক্যটাও শালি-দুলাভাইর অনৈতিক আচরণের জন্য কম দায়ী নয়।

মাওলানা মহসিন বলেন– ঠিক আছে, আমি এমনিতেই তোমাদের কিছু হাদিয়া দিয়ে দেবো। তবে সেটাকে ফিতা কাটা বা প্রতিবন্ধক থেকে মুক্তি পাওয়ার বিনিময় ভাববে না। এটা নিতান্তই হাদিয়া।
মাওলানা মহসিনের কথা শুনে চৈতি ও মাসনা সাবিনার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে মাহিনও।

৬০

সবাই আয়োজন নিয়ে যখন ব্যস্ত, মাসনা তখন মাহিনকে খুঁজে বেড়ায়। হঠাৎ দেখে মাহিন বাইরে দাঁড়িয়ে জাহিদুলের সঙ্গে কথা বলছে। মাসনা চৈতিকে ডেকে বলে– ঐ যে মাহিন দাঁড়িয়ে আছে। ওকে একটু ডেকে দে না!

মাহিনকে ডাকে চৈতি– মাসনা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

–ঠিক আছে তোরা একটু অপেক্ষা কর। জাহিদুলের সঙ্গে কথা শেষ করে আমি আসছি।

জাহিদুলকে বিদায় দিয়ে বাড়ির পেছনের উঠানে চলে যায় মাহিন। সেখানে অপেক্ষারত মাসনা।

মাহিন জিজ্ঞেস করে– তুমি কি জরুরি কিছু বলবে? আজ আমি ভীষণ ব্যস্ত।

মাসনা জানতে চায় তার ভবিষ্যৎ কী। মাহিন কোনো জবাব না দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে মাহিন বলে– আমি তো বলেই দিয়েছি, যে সম্পর্কের শেষটা বিচ্ছেদ দিয়ে হয়, সে সম্পর্ক গড়া থেকে বিরত থাকাই ভালো।

মাসনা কেঁদে ফেলে। বলে– বিচ্ছেদ হবে কেন? যত কিছু হোক, আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না। আর তুমি যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, তাহলে আমার জীবনও আমি রাখব না।

এই বলে চলে যেতে চাইলে মাসনার পথ আগলে দাঁড়ায় মাহিন– ছেড়ে যাবে না তো!

–বলছি তো যাব না।

এখান থেকেই শুরু মাসনা-মাহিনের ভালোবাসা লেনদেন। আর এখান থেকেই শুরু তাদের জীবন ধ্বংসের গল্পও। ভালোবাসা লেনদেনে দু'জন যে সুখ অনুভব করে- সে সুখ যে চরম দুঃখে পরিণত হবে, সেটা তারা জানে না।

মাসনা বলে– আমাদের এ ভালোবাসা পবিত্র। আমি যে তোমাকে ভালোবাসি, সে ভালোবাসায় কোনো অপবিত্রতার ছোঁয়া নেই।

এই সময়ের প্রেমিক-প্রেমিকারা তাদের সম্পর্ককে পবিত্র সম্পর্ক বলে

চালিয়ে দেয়। তারা মনে করে, বিবাহপূর্ব যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তার নাম ভালোবাসা বা প্রেম। আর এ সম্পর্ক দোষেরও নয়। এ সম্পর্ক পবিত্র সম্পর্ক। অথচ বিবাহপূর্ব সম্পর্ক পৃথিবীর সবচেয়ে নাপাক সম্পর্ক। এই সম্পর্কের মাধ্যমেই ব্যভিচারের দিকে অগ্রসর হয় যুবক-যুবতীরা। এসব সম্পর্কের কারণে দেশে আজ এত চারিত্রিক অবক্ষয়। বিবাহপূর্ব গায়রে মাহরাম (যার সঙ্গে দেখা দেওয়া জায়েয নেই) ছেলে-মেয়ের কোনো সম্পর্কই পবিত্র হতে পারে না।

ভালোবাসা নামক জঘন্য এ সম্পর্কের উস্কানী দিয়ে থাকে নাটক-সিনেমা। শুধু টিভি সিনেমা নয়, এখন বিজ্ঞাপন, গল্প, উপন্যাস সবকিছুতেই এই সম্পর্কের আবেদন থাকে! যুবক-যুবতীর প্রেমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয় নানা কৌশলে। আবার এরাই নৈতিকতার কথা বলে! ইভটিজিং, ধর্ষণ, যৌন হয়রানিমুক্ত দেশ চায়! হাস্যকর বিষয়!! চোরকে চুরি করতে বলে গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলা যেমন মুর্খতা, নোবেল-নাটকের মাধ্যমে বিবাহপূর্ব অবৈধ প্রেমের আহ্বান জানিয়ে, ধর্ষণ-যৌনহয়রানিমুক্ত সমাজ আশা করাটাও ঠিক ততটাই মুর্খতা।

পবিত্র ভালোবাসা; সে তো মা-বাবার আদর। পবিত্র ভালোবাসা; সে তো ভাই-বোনের খুনসুটি। পবিত্র ভালোবাসা; সে তো স্বামী-স্ত্রীর আত্মার সম্পর্ক। বিবাহপূর্ব প্রেমিক-প্রেমিকার যৌনতাকে ভালোবাসা বলার সুযোগ নেই।

৬১

সাবিনা ভয়ে কাবু হয়ে বসে থাকে। মাওলানা মহসিন ঘরের মধ্যে ঢুকে সাবিনাকে সালাম দেন। সাবিনা সালামের জবাব দিয়ে কাঁপা কাঁপা শরীরে মাওলানা মহসিনকে কদমবুচি করতে যায়। মাওলানা মহসিন সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলেন– কদমবুচি ইসলামে নেই। কদমবুচি করতে গিয়ে অনেক সময় সেজদা সাদৃশ হয়ে যায়। যেটা সম্পূর্ণ হারাম। সেজদা একমাত্র আল্লাহর জন্য, অন্য কারও জন্য নয়। তাই মাথা যদি নোয়াতেই হয়, একমাত্র আল্লাহর সামনেই নোয়াবে।

মাওলানা মহসিন সাবিনার দুই কাঁধে ধরে বিছানায় বসিয়ে দেন। দরজা

বন্ধ করে নিজেও সাবিনার পাশে বসেন। সাবিনার ভয় এখনও কাটেনি। আমেনা বেগম আগেই নতুন জামাইর জন্য মিষ্টি পায়েস ও দুধ রেখে আসেন সাবিনার ঘরে। দু'জন চুপচাপ বসে থাকে। কেউ কথা বলে না। দু'জনই ভাবছে কী বলা যায়। একদিকে লজ্জা, অন্যদিকে ভয়।

নীরবতা ভাঙে সাবিনা। বিনয়ী কণ্ঠে ছোট্ট করে মিষ্টি ও পায়েস গ্রহণ করার অনুরোধ জানায় স্বামীকে। জীবনের প্রথম কোনো পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে এটাই প্রথম অনুরোধ সাবিনার। মনে মনে ভাবছে, যে মানুষটির সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিল না, সেই মানুষটি আজ কত আপন, কত কাছের।

মাওলানা মহসিন দুধের গ্লাস নিয়ে প্রথমে নিজ হাতে সাবিনাকে পান করিয়ে দেন। সাবিনা লজ্জায় পুরো গ্লাস পান করতে পারে না। অর্ধেকটা পান করে– বাকিটা মাওলানা মহসিনকে পান করার জন্য অনুরোধ জানায়।

একটি মিষ্টি নিয়ে মাওলানা মহসিনকে খাইয়ে দেয়। মাওলানা মহসিন বলেন, জীবনের প্রথম কোনো মেয়ের হাতে মিষ্টি খেলাম। তবে মিষ্টির চেয়ে তুমি আরও বেশি মিষ্টি। সাবিনা লজ্জায় মুখে ঘোমটা টেনে দেয়। মাওলানা মহসিন ঘোমটা উঠিয়ে সাবিনার দিকে তাকান।

সাবিনা বলে– আমার জীবনের চাওয়া-পাওয়া ছিল একজন আলেম স্বামীর সঙ্গিনী হওয়া। সেটা পূরণ হয়েছে। এবার বাকি জীবনের স্বপ্ন পূরণে আপনাকে সঙ্গী হিসেবে চাই।

মাওলানা মহসিন বলেন– তোমার সুখ-দুঃখে সবসময় আমাকে পাশে পাবে। ইচ্ছে ছিল তোমার মতো একজন সরল মেয়ে আমার স্ত্রী হয়ে আসুক। আল্লাহ তাআলা তা মিলিয়ে দিয়েছেন। আমার অর্থবিত্ত নেই। কিন্তু বিশাল একটি স্বপ্ন আছে। তোমাকে পাশে পেলে আমার স্বপ্ন পূরণে আমি যথেষ্ট প্রত্যয়ী হতে পারব। আমার সুখ-দুঃখে তোমাকে পাশে চাই। আমি চাই তুমি একজন আদর্শ গৃহবধূ হয়ে জীবনের শেষ অবধি আমার সঙ্গে কাটিয়ে দেবে। দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই কীভাবে সংসার জীবনে সুখী হতে হয়।

বর্তমান সময়ে ছেলে-মেয়েরা বিবাহপূর্ব প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু আমাদের ভালোবাসার সম্পর্কটা বিয়ের পর থেকে শুরু হবে এবং এ ভালোবাসা দিনদিন বাড়তেই থাকবে। যে ভালবাসায় কোনো খাঁদ

থাকবে না। যে ভালবাসায় কোনো ভেজাল থাকবে না। থাকবে না কোনো প্রতিবন্ধকতা। থাকবে শুধু ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও আনন্দ।

৬২

রাত অনেক হয়েছে। মাসনাদের বাড়ি ফিরতে হবে। মা-বাবা চিন্তা করবেন। মাসনা চৈতিকে বলে– বাড়ি যাব কীভাবে? রাত তো অনেক হয়েছে। চৈতি মাহিনকে অনুরোধ জানায়, তাদের দু'জনকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। আমেনা বেগমও মাসনা-চৈতিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে বলেন।

চৈতি ও মাসনাকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয় মাহিন। প্রথমে চৈতিকে পৌঁছে দিতে মাসনাসহ চৈতির বাড়ি যায়। যাওয়ার পথে চৈতি বলে– তোমরা একে অপরকে ভুলে যেও না। শত বাধা এলেও একে অপরকে আঁকড়ে রাখবে।

তিনজন গল্প করতে করতে চৈতিদের বাড়ি পৌঁছে। চৈতিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে মাসনা ও মাহিন রওনা হয় মাসনাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে। রসালো গল্প ও প্রেমালাপে মেতে ওঠে দু'জন। তাদের মনে হয় পৃথিবীর সব সুখ তাদের কাছে ধরা দিয়েছে।

–আজকের রাতটা যদি অনেক বড় হতো! তোমার সঙ্গে আরও সময় কাটাতাম। তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমুতাম। কবে আসবে সেই সময়, যেদিন ছোট্ট একটি ঘরে শুধু তুমি আর আমি বাধাহীন সময় কাটাব; বলে মাসনা।

মাহিন বলে– ধৈর্য ধারণ করো। সময় হলে নিশ্চয়ই আমরা সুখের ঘর বাঁধব।

গল্প করতে করতে মাসনাদের বাড়ির অতি নিকটে চলে যায় তারা। মাসনাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না তার। মাসনাও যেতে চায় না মাহিনকে ছেড়ে। কিন্তু যেতে যে হবেই। মাহিনের হাত ধরে রাখে মাসনা। জীবনের প্রথম কোনো মেয়ের ছোঁয়া লাগে মাহিনের হাতে। সারা শরীর শিরশির করে ওঠে তার। মাসনা মাহিনের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

মাহিন জানে না ঐ হাত ধরা কোনো সুখের ছোঁয়া নয়, ঐ ছোঁয়া ভবিষ্যৎ অন্ধকারের পূর্বাভাস। ঐ ছোঁয়া জীবনের শান্তি কেড়ে নেওয়ার ছোঁয়া।

৬৩

মাহিন আবেগাপ্লুত। মাহিনের হাত আরও শক্ত করে ধরে মাসনা। মাহিন বলে– ভালোবাসায় এত সুখ আগে জানা ছিল না। জানা থাকলে অনেক আগেই তোমাকে ভালোবাসতাম।

–বহুদিন থেকেই এই সুখ তোমাকে দেবো বলে তোমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে থেকেছি। তোমার সাড়া না পেয়ে কত রাত ঘুমহীন কেটেছে আমার। সকাল-বিকাল, দুপুর-রাত শুধু তোমাকে নিয়েই ভেবেছি। পড়ার টেবিল, সেখানেও তুমি। ক্লাস, সেখানেও তুমি। তোমার প্রেমে আমি ব্যাকুল। কিন্তু সাড়া না পেয়ে অন্তহীন যন্ত্রণা বয়ে বেড়িয়েছি আমি। আজ তোমার সাড়া পেয়ে বুঝতে পেরেছি তোমার ভালোবাসা কত গভীর এবং আনন্দময়।

মাসনা জানে না এই আনন্দময় ভালোবাসা একসময় বেদনাময় সম্পর্কে পরিণত হবে।

দু'জন আরও কাছাকাছি আসে। পাশাপাশি দাঁড়ায়। কথার ফাঁকে নিজেদের অজান্তেই একে অপরকে জড়িয়ে ধরে তারা। তাদের মনে হয়, এ যেন স্বর্গীয় সুখ।

অথচ তাদের জানা নেই- বিবাহপূর্ব কোনো মেয়েকে ছেলের স্পর্শ কিংবা কোনো ছেলেকে মেয়ের স্পর্শ করা সম্পূর্ণ হারাম। এ স্পর্শ মাটিও সহ্য করে না। বিবাহপূর্ব অবৈধ সম্পর্কের অবাধ মেলামেশাকারীদের গিলে ফেলতে চায় মাটি।

আল্লাহ বলেছেন– "তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না"। ইসলামী গবেষকরা বলেন, যেনা-ব্যভিচারের কাছে যেও না বলতে মূলত একজন নারী ও একজন পুরুষ এতটুকু দূরত্বে থাকবে, দৃষ্টি

যতটুকু যায়। গায়রে মাহরাম (যাদেরকে বিয়ে করা জায়েজ; বৈধ) কোনো নারী কিংবা পুরুষকে যদি দৃষ্টি সীমায় দেখা যায়, তাহলে সেখান থেকেই দু'জন দু'দিকে সরে যাবে। কারণ, যদি দু'জন সামনা-সামনি হয়, তাহলে দু'জনের মাঝে পরিচয় ঘটে যেতে পারে। পরিচয় হলে কথার বিনিময় হতে পারে। কথার বিনিময় হলে, সম্পর্ক গভীর হতে পারে। সম্পর্ক গভীর হলে দু'জনের মাঝে প্রেম বিনিময় হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। যার শেষফল ব্যভিচার। আর এটাই হলো– "তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না" পবিত্র কোরআনের বাণীর মূল উদ্দেশ্য।

এটা স্বাভাবিক যে, প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ে একজায়গায় হলে, পাশাপাশি বসলে, তাদের মাঝে শয়তান প্রবেশ করে এবং দু'জনকে দু'জনের প্রতি যৌন উপভোগের জন্য লালায়িত করে তোলে। ফলাফল চরম ভয়ঙ্কর। এজন্য গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষ কিংবা যুবক-যুবতী কাছাকাছি যাওয়ার মতো পরিবেশ যেন তৈরি না হয়, সে ব্যাপারে সবার সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিৎ।
ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন– আমাকে এবং ৬০ বছরের বৃদ্ধাকে যদি একই ঘরে দেওয়া হয়, আমি আবু হানীফা ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকি, আমার ঈমান দিয়ে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব কী না ভেবে।

৬৪
দু'জন খোশগল্পে মেতে ওঠে। গল্পের মাঝে মাওলানা মহসিন বলেন– তাহাজ্জুদের সময় হয়েছে, চলো অজু করে তাহাজ্জুদ পড়ে নিই। অযু করে তাহাজ্জুদের বিছানায় দাঁড়ায় নবদম্পতি। নামায আদায় করে মাওলানা মহসিন হাত তুলে মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে ফরিয়াদ করতে শুরু করেন– হে পরওয়ারদিগার! আজ আমাদের বিয়ের প্রথমরাত। আমাদের সংসার সুখময় করে দাও! ইসলামের আলোয় আলোকিত করো আমাদের সংসার। আমাদেরকে যদি সন্তান দান

করো, তবে নেক সন্তান দান করো। যে সন্তান এলাকা, সমাজ ও দেশের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে আলো ছড়াবে- সে সন্তান দিও!
হে রহমানুর রহীম! যত দুঃখ-কষ্টেই থাকি না কেন, আমরা যেন তোমার বিধান মতো চলতে পারি তৌফিক দাও। আমরা যেন দু'জন দু'জনকে সবসময় বুঝতে পারি, আমাদের মাঝে যেন ভুল বোঝাবুঝি না হয়, সবকিছু নিজেরা মানিয়ে নিতে পারি, সে তৌফিক দাও প্রভু। হে আল্লাহ! আমাদের ফরিয়াদ কবুল করো।
সাবিনা স্বামীর মোনাজাতের সঙ্গে সঙ্গে আমীন বলে, আর দু'চোখের পানি ছেড়ে কাঁদে।
মাওলানা মহসিন সাবিনাকে সামনে বসিয়ে ওয়াদা করান, কোনোদিন ইসলামপরিপন্থী চলবে না, স্বামীকে ভুল বোঝবে না এবং সুখ-দুঃখে তার পাশে থাকবে। সাবিনাও প্রতিশ্রুতি দেয়; স্বামী যেভাবে চালাবে, আল্লাহ তাআলার রেজামন্দির জন্য সেভাবেই চলবে। স্বামীর সুখ-দুঃখে তাঁর পাশে থাকবে। সাবিনা নিজেও মাওলানা মহসিন থেকে ওয়াদা চায়- সাবিনার সুখ-দুঃখে স্বামীকে যেন পাশে পায়। এভাবেই দু'জন দু'জনার সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

সংসারে সুখের জন্য স্বামী-স্ত্রীর এই বোঝাপড়াটা খুবই জরুরি। অন্যথায় সংসার সুখের হয় না। তাই বিয়ের প্রথম রাতেই মাওলানা মহসিন ও সাবিনা ওয়াবদ্ধ হয়ে নেয় দু'জন দু'জনার সঙ্গে।

ইসলামিক ধ্যান-ধারণার মানুষদের আচরণ এমই হয়। এভাবেই শুরু হয় তাদের সংসার। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন– "হে আল্লাহ! আমাকে নেক সন্তান দান করো!" আল্লাহ তাআলা নবীর দোয়া কবুল করে ধৈর্যশীল নেক সন্তানের সু-সংবাদ দেন। হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামকে নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সন্তান করে পৃথিবীতে পাঠান।

স্বামী-স্ত্রী তাহাজ্জুদের বিছানায় একত্রে দোয়া করা, স্বামীর দোয়ায় স্ত্রীর আমীন আমীন বলা, এ তো শুধু দোয়া নয়, এ যে কতবড় নেয়ামত, যাদের ইসলামিক জ্ঞান নেই তারা কী করে বুঝবে! স্বামী-স্ত্রীর এরূপ

দোয়ায় আল্লাহ তাআলার রহমত মুষলধারা বর্ষিত হয়। এসব সংসারে দুঃখের ন্যুনতম ছোঁয়াও লাগে না। খেয়ে থাকুক- চাই না খেয়ে থাকুক, ভালো থাকুক আর খারাপ থাকুক, সুস্থ থাকুক কিংবা অসুস্থ, সবসময় এ ধরণের সংসারগুলো সুখের হয়ে থাকে। সংসারগুলো অন্যদের জন্য হয়ে ওঠে অনুসরণীয়।

মাওলানা মহসিন জায়নামায ছেড়ে বিছানায় উঠে বসেন। সাবিনাও মাওলানা মহসিনের পাশে বসে। মাওলানা মহসিন সাবিনাকে কাছে টানেন। শিহরিয়ে ওঠে সাবিনা। প্রতিটি মুহূর্ত স্মৃতির পাতায় প্রোথিত হতে শুরু করে তার। প্রতিটি মুহূর্ত যেন নতুন নতুন আনন্দ, ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ। নতুন অভিজ্ঞতা।
একটা থেকে অন্যটা আরও বেশি উপভোগ্য। দু'জন কাছাকাছি, পাশাপাশি, কী গভীর সম্পর্ক। যারা দু'দিন আগে এক অপরকে চিনত না- আজ তারা অতি আপন। তাদের মাঝে কোনো বাধা নেই। নোই কোনো প্রতিবন্ধকতা। গল্প করতে করতে সুখের সাগরে হারিয়ে যায় দু'জন। এক অন্যরকম অনুভূতি।

৬৫
মাসনাকে বিদায় জানিয়ে চলে আসে মাহিন। রাত বেশ গভীর। বিয়ের রাত বলে কে কোথায় আছে, সে খবর নেওয়ার মতো সময় ছিল না কারও। যার যার মতো করে ঘুমিয়ে থাকে। মাহিন বাড়িতে প্রবেশ করে। পুরো বাড়িতে সুনসান নীরবতা। মাহিন গুটি গুটি পায়ে নিজ ঘরে চুপচাপ শুয়ে পড়ে। চোখে ঘুম নেই। জীবনে কী ঘটে গেলো! চোখের সামনে শুধু মাসনা আর মাসনা। মাসনার প্রেমে পাগলপারা মাহিন।

প্রেম মানুষকে অন্ধ করে দেয়। করে দেয় বধির। জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে প্রেমিকযুগল। মাহিনের সামনে কতবড় বিপদ- তা বোঝার জ্ঞানও হারিয়ে ফেলে সে। বিবাহপূর্ব অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক কখনও সুখ বয়ে আনে না। পৃথিবীতে এমন কোনো ইতিহাস নেই, প্রেমের

সম্পর্কের মাধ্যমে কেউ সুখী হতে পেরেছে। যদিও দু'চারজন পাওয়া যায়, সেটা সম্পূর্ণ কাকতালীয়। কারণ যে সম্পর্ক অনৈতিকতা ও অবৈধ নীতির মাধ্যমে শুরু হয়, সে সম্পর্কের মাধ্যমে কখনও সুখ আসতে পারে না।

বিছানায় শুয়ে কল্পনার সাগরে ডুব দেয় মাহিন। মাসনা কীভাবে হাত ধরেছিল, কীভাবে কথা বলেছিল, কীভাবে জড়িয়ে ধরেছিল, অনুভূতি কী ছিল, এগুলো নিয়েই ভাবতে ভাবতে রাত কেটে যায় তার। কাল দেখা হলে আমিও মাসনাকে জড়িয়ে ধরব, চুমু খাব, ওর কোলে মাথা রাখব ইত্যাদি কু-মতলব, কু-মন্ত্রণা বাসা বাঁধতে শুরু করে মাহিনের অন্তরে।

এসব অবৈধ সম্পর্ক শুধু যৌনতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। দু'জন দু'জনকে নিয়ে যেভাবে ভাবনার সাগরে ডুব দেয়- তাতে যে কত গোনাহ্ হয়, তা কল্পনাও করা যায় না। একটি ছেলে একটি মেয়েকে অথবা একটি মেয়ে একটি ছেলেকে নিয়ে কল্পনা করা, স্বপ্ন বাঁধা, এগুলো অন্তরের যেনা-ব্যভিচারের শামিল। আর এই গোনাহ অবৈধ সম্পর্কের কারণেই হয়ে থাকে। যা থেকে প্রেমিক-প্রেমিকার বাঁচার কোনো পথ নেই।
দু'জন আলাদা হয়ে গেলে পরদিন কীভাবে দু'জন কাছাকাছি আসবে, কাছাকাছি বসবে, কে কাকে কী বলবে, এগুলো ভাবতে ভাবতে সময় চলে যায়। যখন কাছাকাছি আসে, কীভাবে স্পর্শ করা যায়, কীভাবে একে অপরকে জড়িয়ে ধরা যায়, সেই চিন্তায় সময় কেটে যায়। আর এসব চিন্তা করতে করতেই একসময় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে প্রমিকযুগল। প্রেম-ভালোবাসার এটাও একটা পরিণতি।

আর বর্তমান সময়ে প্রেম-ভালোবাসার নতুন ভার্সন হলো, প্রেম মানেই যৌনতা। প্রেমের সম্পর্ক হয়েছে তো পার্কে যাও! উদ্যানে চলো! চিড়িয়াখানার বাগানে যাও! নিজের সতীত্ব বিলিয়ে দাও প্রেমিক নামক এক পশুর হাতে। তুমি প্রেমিক? তো প্রেমিকার চাহিদা মেটাতে তোমার ভেতরের মনুষ্যত্বকে বের করে ফেলে দিয়ে পশুত্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো তার ওপর। এবার দু'জন পৈশাচিক আনন্দে মেতে ওঠো!

প্রেম মানুষকে অন্ধ করে দেয়, করে দেয় বধির, বিবেকশূন্য। বর্তমান সময় প্রায়ই দেখা যায়- যুবক-যুবতী কিংবা স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী নামক প্রেমযুগলের ভিডিও স্ক্যান্ডাল ভাইরাল হতে। যারা অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, সত্যিই তারা বধির ও অন্ধ হয়ে থাকে। ফলে কেউ একজন ভিডিও করছে তা ওদের নজরে পড়ে না। কখনও কখনও সবার সামনেই এসব করে থাকে। ফলাফল; ইজ্জত, সম্মান, সামাজিক মর্যাদা সবকিছু বিলীন হয়ে যায়। শেষ পরিণতি অপমান, লাঞ্ছনা কিংবা আত্মহত্যা।

বর্তমান সময়ে বিছানায় শোয়া ছাড়া নাকি প্রেম পূর্ণই হয় না। বলা যায়, প্রেমের অপর নাম যৌনতা। পার্কে নিজেকে বিছিয়ে দাও, উদ্যানে নিজেকে বিলিয়ে দাও, আন্ধার জঙ্গলে সবকিছু সঁপে দাও, এটাই নাকি প্রেম! এটা প্রেম নয়, বরং ব্যভিচার ও পশুত্ব।

৬৬

হাসি-আনন্দের মাঝে তিনদিন পেরিয়ে যায় মহসিনও সাবিনার। কী করে যে দিন চলে গেলো টেরও পায় না নবদম্পতি। এবার বাড়ি যেতে হবে মাওলানা মহসিনকে। কিন্তু যেতে দিতে চায় না সাবিনা। বলে– আমি আপনাকে ছাড়া থাকতে পারব না!

মাওলানা মহসিন মুচকি হেসে বলেন– যারা তোমাকে এত বছর লালন-পালন করেছেন, বিয়ের আগেও যে তুমি বলেছিলে মা-বাবা ছেড়ে থাকতে পারবে না, সেই তুমি মাত্র তিনদিনেই তাদের ভুলে গেলে!

সাবিনা কোনো উত্তর দিতে পারে না। শুধু এতোটুকু বলে– আমি কিছু শুনতে চাই না, আমি আপনাকে ছাড়া থাকতে পারব না ব্যাস! এই বলে কেঁদে ফেলে সাবিনা। মাওলানা মহসিন বলেন– এর নামই প্রকৃত ভালোবাসা। পবিত্র ভালোবাসা। এ ভালবাসায় কোনো অন্যায় নেই।

শাশুড়ী আমেনা বেগম ও শ্বশুর জমির উদ্দীন থেকে বিদায় নিয়ে নিজ কর্মস্থলে রওয়ানা হন মাওলানা মহসিন। আমেনা বেগম বলেন– বাবা তুমি আমাদের আরেকটি ছেলে। তোমার আমানত সাবিনা এতদিন

আমাদের কাছে ছিল। তোমার আমানত তোমার কাছে ফিরিয়ে দিলাম। তুমি দেখে রেখো ওকে। তবে ও আমাদের ভীষণ আদরের ছিল। ও আমাদের একমাত্র মেয়ে। ও ছোট। অনেককিছু বোঝে না। ভুল করলে বুঝিয়ে নিও। ওর সঙ্গে রাগ করো না।
মাওলানা মহসিন বলেন– চিন্তা করবেন না মা, আমি সাবিনার কোনো অযত্ন হতে দেবো না। আপাতত ১ বছর সাবিনাকে এ বাড়িতেই রাখতে চাই। আমি একটু পরিপাটি হলে ইনশাল্লাহ ওকে নিয়ে যাব। তাছাড়াও মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করতে করতে সাবিনাও স্বাভাবিক হোক। তাতে আমার ও আপনাদের উভয়েরই সুবিধা। মাওলানা মহসিনের প্রস্তাবে আমেনা বেগম বেশ খুশি। তিনি তো এমনটাই চেয়েছেন। তাই খুশি হওয়ারই কথা। ঘরের সবাই বিদায় জানান মাওলানা মহসিনকে।

৬৭

দিনদিন দু'জন দু'জনার প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে। সবকিছু ফেলে দু'জন দু'জনকে নিয়েই ভেবে সময় পার করে দেয়। কোনো কাজে মন বসে না। পড়ার টেবিলে মন বসে না, পরীক্ষায় আগের মতো রেজাল্ট হয় না, সব যেন ওলট-পালট হয়ে যায় মাসনা-মাহিনের।
এভাবেই চলতে থাকে দিনের পর দিন। মাহিন আগের মতো প্রাইভেট পড়াতে যায় না। বাড়ির কাজ করে না। চেহারা নষ্ট হয়ে গেছে। ক্লাসের নাম করে বাড়ি থেকে বের হলেও ক্লাসে যায় না। মাসনাকে নিয়ে সারাদিন এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরির পর সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে। মাসনারও ঠিক একই অবস্থা।

একদিন মাসনার জন্য একটি উপহার কেনার উদ্দেশ্যে বাজারে যায় মাহিন। হঠাৎ পথিমধ্যে অপরিচিত একলোক মাহিনের পথ আটকান!
–কী ব্যাপার! কে আপনি? এভাবে হঠাৎ কেউ সামনে এসে দাঁড়ায়?
লোকটি কোনো উত্তর না দিয়ে উল্টা মাহিনকে জিজ্ঞেস করেন– আপনি কি মাহিন?
–হ্যাঁ, আমিই মাহিন।

লোকটাকে স্বাভাবিক মনে হয় না। লোকটি আবার প্রশ্ন করেন– রাশেদ আপনার ভাই?

–হ্যাঁ। আচ্ছা কী হয়েছে বলবেন কি?

আগন্তুক বলেন– আমি পাশের থানা থেকে এসেছি। লোক মারফত জানতে পারি আপনি মাহিন এবং রাশেদ আপনার ভাই। আপনাদের পাশের গ্রামে আমার বোন বিয়ে দিয়েছি। আপনার ভাইর দোকানের রেগুলার কাস্টমার ছিল আমার বোন। ওর স্বামী দেশের বাইরে থাকে। আমরা জানতে পারি, আপনার ভাই রাশেদের সঙ্গে ওর কোনো একটা অনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। এটা জেনে বোনকে বহুবার সতর্ক করেছি। কিন্তু গতকাল থেকে ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর তিনটি বাচ্চা আছে। ওরা খুব কান্নাকাটি করছে। আমাদের সন্দেহ- হয়ত আপনার ভাইয়ের সঙ্গেই কোথাও আছে ও। আপনি একটু খবর নিয়ে দেখেন।

এই বলে মাহিনের ফোন নাম্বার নিয়ে চলে যান আগন্তুক। মাসনার জন্য আর উপহার কেনা হয় না মাহিনের। লজ্জায় কষ্টে মাথা নুয়ে যায় তার। কী করবে ভেবে পায় না। শরীরে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় মাহিন।

দ্রুত পায়ে বাজারে যায়। বড়ভাই রাশেদকে জিজ্ঞেস করতেই হবে, এসবের সত্যতা কতটুকু। নাহয় মানুষ জানাজানি হলে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। কিন্তু বাজারে গিয়ে দেখে, বড়ভাই রাশেদের দোকান বন্ধ। তাহলে ঘটনা কি সত্য? এটা কীভাবে সম্ভব! একবার চিন্তা করে- বড়ভাইর বাসায় যাবে। আবার চিন্তা করে- না যাওয়া যাবে না। তাহলে ভাবীও বিষয়টা জেনে ফেলবে। আর তাতে অশান্তি আরও বাড়বে। দেরি না করে তাৎক্ষণিক বাড়ির পথ ধরে মাহিন।

৬৮

সাবিনার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। মাওলানা মহসিন লম্বা বিরতিতে মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ি যান। কর্মস্থলে থাকাকালীন মোবাইলে খোঁজ-খবর রাখেন শ্বশুরবাড়ির লোকজনের। বিশেষ করে সাবিনার। বাকি সময় মাদরাসায় ছাত্রদের পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করেন।

ছাত্রদের গড়ে তোলার দায়িত্বটা যথাযথ পালনের চেষ্টা করেন সবসময়। অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা, অবৈধ জিনিস গ্রহণ না করা, মুরুব্বিদের সঙ্গে ভদ্র আচরণ করা, কারও সঙ্গে মারামারি না করা, সবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, অন্যের জিনিস অনুমতি ছাড়া না ধরা- এসব বিষয় ছোট থেকেই ছাত্রদের মগজে-মননে প্রোথিত করেন মাদরাসা শিক্ষকরা। মাওলানা মহসিনও তার ব্যতিক্রম নন।

৬৯

বাবা-মা'র কাছে কীভাবে বলবে সে কুল পায় না মাহিন। মনের মধ্যে চাপা কষ্ট নিয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে সে। বাবা-মা এমন খবর শোনলে ধৈর্য ধরতে পারবেন তো! ঠিক থাকতে পারবেন তো আদর্শবান পিতা-মাতা! সাবিনার নতুন বিয়ে হয়েছে। ওর বর মাওলানা মহসিন কী ভাববে? কীভাবে মুখ দেখাব মাসনাকে! ওর সঙ্গে নতুন সম্পর্ক হলো মাত্র। এসব জানতে পারলে সম্পর্ক রাখবে তো! নানা প্রশ্ন মাথায় নিয়ে বাড়ি পৌঁছে মাহিন। চেহারায় বিষণ্নতা দেখে আমেনা বেগম জানতে চান– কী হয়েছে?

মাহিন কথা বলতে পারে না। কী বলবে! টেনশনে নিজের ঘরে গিয়ে বসে থাকে। পেছনের উঠানে সাবিনা বালিশের কাভারে সুঁই-সুতা দিয়ে প্রাকৃতিক চিত্রাঙ্কন করছে।আমেনা বেগম সাবিনাকে বলেন– মাহিনকে জিজ্ঞেস কর ওর কী হয়েছে। ওকে স্বাভাবিক মনে হয় না।

মায়ের কথায় সাবিনা ভাবে- মাসনার সঙ্গে কোনো মনোমালিন্য কিংবা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে সম্ভবত।

মাহিনের ঘরে চলে যায় সাবিনা। মাথা নিচু করে চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রেখে কী যেন ভাবে মাহিন।

–কোনো প্রবলেমে আছিস ভাইয়া?

প্রশ্ন করে সাবিনা। সাবিনাকে দেখে কেঁদে ফেলে মাহিন– আমাদের কী হবে সাবিনা! সব বুঝি শেষ হয়ে গেলো।

মাহিনের চোখে পানি দেখে সাবিনা কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

মাহিনের মাথায় হাত রেখে সাবিনা বলে– ভাইয়া একটু শান্ত হয়ে নে। তারপর বল কী হয়েছে।

মাহিন বলে– যা হয়েছে তা কাউকে বলার মতো নয়। আবার না বলেও পারব না।

এবার সাবিনা কিছুটা ভয় পেয়ে যায়। মাহিনকে একগ্লাস পানি দিয়ে বলে– পানিটা পান করে নে। এবার বল!

মাহিন বলতে শুরু করে– কিছুক্ষণ আগে আমি বাজারের দিকে যাই। এ সময় একলোক পথ আটকে দাঁড়ান। কোনো ভূমিকা ছাড়াই আমার নাম জানতে চান। লোকটাকে খুব বেশি চিন্তিত দেখে আমি ভয় পেয়ে যাই। বড় ভাইয়ার পরিচয়ও জানতে চান তিনি। এরপর নিজ থেকেই তার পরিচয়ও পেশ করেন। পরিচয় শেষে লোকটি যা বললেন, তাতে আমি রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ি।

সাবিনা তন্ময় হয়ে শোনে মাহিনের কথা। মাহিন ঢোক গিলে আবার বলতে শুরু করে– বড়ভাইয়ার সঙ্গে নাকি তার বোনের পরকীয়া রয়েছে! তার বোনের স্বামী একজন প্রবাসী।

প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে বড়ভাই রাশেদের পরকীয়া রয়েছে শুনে সাবিনা পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। রক্ত যেন চলছে না। সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায় তার। দাঁড়ানো থেকে বসে পড়ে– কী বলছিস ভাইয়া! কী শুনালি এসব!

এাহিন-সাবিনা দু'জনই চিন্তিত। বাবাকে কীভাবে শুনাবে এই দুঃসংবাদ? এ যে অস্তিত্বের প্রশ্ন! বাবা দিনমজুরের কাজ করলেও পুরো এলাকায় আদর্শবান একজন মানুষ হিসেবে পরিচিতি আছে জমির উদ্দীনের। নীতির প্রশ্নে কখনও আপোষ করেননি তিনি। দু'জনার এসব ভাবনার মাঝেই আমেনা বেগম চলে আসেন– কী রে সাবিনা! মাহিন কিছু বলেছে?

–কী বলবে মা! বলার কিছুই নেই। যা শুনেছি, তুমি সহ্য করতে পারবে না।

আমেনা বেগম শাসনের সুরে বলেন– আমি তোদের পেটে ধরেছি, সহ্যশক্তি আমার চেয়ে তোদের বেশি নয়!

সাবিনা ঘটনা খুলে বললে তিনি পেরেশান হয়ে যান! একবার সামনের ঘরে, একবার পেছনের ঘরে, একবার উঠানে, একবার পুকুর ঘাটে

যান। কী হয়ে গেলো! কেন হলো! কী অভাব রাশেদের? তোদের বাবা কীভাবে সহ্য করবেন এই কলঙ্কের সংবাদ! মানুষটা জীবনভর তোদের জন্য করে গেছেন। তোরা বিনিময় কী দিলি! শেষ বয়সে এসেও মানুষটাকে একটু স্বস্তিতে থাকতে দিলি না!

৭০

ইতোমধ্যে বাইরের কাজ শেষে বাড়ি ফেরেন জমির উদ্দীন। আমেনা বেগম স্বামীকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন– আমরা এমন কী অন্যায় করেছিলাম! কী অপরাধ ছিল আমাদের! যে এতবড় সর্বনাশ হয়ে গেলো!

স্ত্রীর মুখে হঠাৎ এমন কথা শুনে জমির উদ্দীন ঘাবড়ে যান। তিনি ভাবেন সাবিনার কোনো সমস্যা হলো কী না।

–কী ব্যাপার কী হয়েছে তোমার? এমন কী ঘটেছে যে এভাবে কাঁদছো? সাবিনাকে ডেকে কী হয়েছে জানতে চান জমির উদ্দীন। কেউ কিছু বলছে না।

–কী ব্যাপার তোমরা কথা বলছ না কেন?

ক্রুধের সঙ্গে বলেন জমির উদ্দীন।

আমেনা বেগম বলেন– রাশেদ নাকি কোন প্রবাসীর স্ত্রীকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

জমির উদ্দীনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। 'ইয়া আল্লাহ' বলে একটা চিৎকার দেন জমির উদ্দীন। শরীর কাঁপছে তাঁর। মাহিন দৌড়ে গিয়ে বাবাকে ধরে বিছানায় বসিয়ে দেয়। জমির উদ্দীনের দু'চোখ দিয়ে পানি ঝরে।

–এই কি ছিল আমার জীবনে! রাশেদ ছাত্রজীবন থেকে এভাবেই আমাদের কাঁদিয়েছে, কষ্ট দিয়েছে, জায়গায় জায়গায় আমাদের ইজ্জত ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে। কবে ঠিক হবে ওর চরিত্র! এ আমি কী শুনছি! ওর বিয়ের প্রয়োজন হলে আমাকে বলত, ইসলামে সামর্থ হলে তো একাধিক বিয়ের অনুমতি আছে। কিন্তু এটা ও কেন করল। তাও আরেকজনের স্ত্রী! ছিঃ!!

দুঃখ করে বলেন জমির উদ্দীন।
পুরো ঘরজুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া। কারও মুখে হাসি নেই, চোখে ঘুম নেই। নির্ঘুম রাত কাটে সবার। ফজরের নামায আদায় করে- আল্লাহ তাআলার দরবারে হু হু করে কেঁদে ওঠেন জমির উদ্দীন– হে আল্লাহ! ইজ্জতের মালিক আপনি। সম্মানের মালিক আপনি। আপনি জানেন আমার অন্তর কী বলে। আপনি জানেন আমার ভবিষ্যতে কী আছে। আর যাই থাকুক, অসম্মান দিয়েন না আল্লাহ!
জমির উদ্দীনের দোয়ায় ঘরের সবাই আমীন আমীন বলে কাঁদেন। রাতে কেউ কিছু খায়নি, ঘুমোয়নি। খাবারের প্রতি কারও চাহিদা নেই।
ভবিষ্যৎ করণীয় কী? তা নিয়ে কথা বলে মাহিনের পরিবার। আলোচনার মাঝে চলে আসে রাশেদের স্ত্রী। এসেই শাশুড়ীকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে।
–কী ঘটে গেলো আমার জীবনে। এ কী হলো! কী অভাব ছিল আমার। বিয়ের পাঁচবছর হলো না, এর মাঝেই আপনাদের ছেলে এ কাজটা করতে পারল? আমি তিন সন্তানের মা! আমি কীভাবে মানুষকে মুখ দেখাব? আমার মা-বাবাইবা কী বলবেন!
ছেলের বউর প্রশ্নের জবাব নেই তাদের কাছে।

৭১

এভাবে চলে যায় আরও কিছুক্ষণ। হঠাৎ মোবাইল বেজে ওঠে মাহিনের। কল রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে ভারী কণ্ঠ– বাবা আপনি মাহিন বলছেন?
বয়স্ক কেউ প্রশ্ন করেন মাহিনকে।
–জ্বি, আমি মাহিন।
–আমার ছেলে গতকাল আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল। আমি সেই হতভাগা বাবা, যার মেয়েকে নিয়ে আপনার ভাই নিরুদ্দেশ হয়েছে। নাতনী তিনটার কান্নায় ঘুমুতে পারছি না। বাড়িতে থাকা দায় হয়ে পরছে। ওদের কান্নায় আকাশ-পাতাল ভারী হয়ে উঠছে। ওরা মা মা বলে দিনরাত কাঁদছে। শুধু মাকে খুঁজছে ওরা। মায়ের হাতে খাবে,

মায়ের সঙ্গে ঘুমুবে, কী জবাব দেবো বুঝতে পারছি না। আমার মত ব্যর্থ বাবা পৃথিবীতে হয়ত আর নেই। এমন মেয়ের বাবা আমি তা ভাবতেও ঘৃণা হয়। তিনটা বাচ্চা রেখে এভাবে কেউ চলে যায়? বাচ্চাদের প্রতি কী কোনো মায়া ছিল না ওর? ও কি আমাদের ইজ্জতের কথা একটুও ভাবল না? নারী জাতির সবচেয়ে বড় অলঙ্কার তার স্বামী। ফোনের ওপাশে কথা বলছেন; কখনও রাগ, কখনও হতাশা, আবার কখনও কাঁদছেন ভদ্রলোক।

–কী থেকে কী হয়ে গেলো। ওর জামাই নিয়মিত বিদেশ থেকে টাকা পাঠায়। বাচ্চাদের খোঁজ-খবর নেয়। ওর নিজেরও খোঁজ-খবর রাখে। প্রতি ছয়মাস পরপর দেশে আসে মেয়ের জামাই। ভালোই তো দেখেছি ওদের সংসার। এরপরও কী প্রয়োজন ছিল এভাবে সবাইকে ছেড়ে আরেকজন পুরুষের হাত ধরে চলে গেলো? শুনেছি আপনার ভাইয়েরও নাকি সংসার আছে, তার-ইবা কেমন রুচি?

আর বলতে পারেন না ভদ্রলোক। মোবাইলের ওপাশ থেকে অঝোর ধারায় কাঁদছেন তিনি। মাহিন শুধু শুনে যায়। ভদ্রলোকের কথার কোনো উত্তর দিতে পারে না।

সবাই চায় ঘটনা ধামাচাপা দিতে। কারণ সবার ইজ্জতের প্রশ্ন। এভাবেই চলে যায় কিছুদিন। বাপের বাড়িতে চলে যায় রাশেদের স্ত্রী।

৭২

হঠাৎ একদিন পুলিশ আসে মাহিনদের বাড়ি। পুলিশের হাতে ওয়ারেন্ট পেপার। পুলিশ জানায়, রাশেদের স্ত্রী তাদের নামে মামলা করেছে। রাশেদ স্ত্রীকে তালাক পাঠানোয় প্রতিশোধের নেশায় স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে মামলা করে সে। রাশেদকে না পেয়ে পিতা জমির উদ্দীনকে সবার সামনে দিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ। দুইমাস হাজতে থাকেন জমির উদ্দীন। এদিকে মাহিন অনেক কষ্টে কিছু টাকা জমিয়ে দুইমাস পর বাবাকে ছাড়িয়ে আনে জেল থেকে। তখনও কোনো খোঁজখবর নেই রাশেদের।

'এই মুখ নিয়ে এলাকায় যেতে পারব না। এলাকা ছাড়তে চাই আমি'।

জেল থেকে বেরিয়ে মাহিনকে লক্ষ্য করে বলেন পিতা জমির উদ্দীন। মাহিন বল্লো– আগে বাড়ি চলো বাবা। মা অনেক চিন্তায় আছে। দুইটা মাস আমাদের কীভাবে গেছে তোমাকে বুঝাতে পারব না। আমরা ক্লান্ত। কাবু হয়ে গেছি বাবা।

পিতা জমির উদ্দীনকে নিয়ে বাড়ি ফেরে মাহিন।

আমেনা বেগম দুইমাসে বেশ শুকিয়ে যান। চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে যায়। বাবার জন্য কাঁদতে কাঁদতে সাবিনারও একই অবস্থা। এর মাঝে মাওলানা মহসিন মাহিনদের বাড়ি দুইবার আসেন, কিন্তু ঘরের কেউ তাকে এসব বিষয়ে কিছু জানায় না। মাওলানা মহসিন শ্বশুর জমির উদ্দীনের কথা জানতে চাইলে- 'তিনি কোনো এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেছেন' বলেই উত্তর পান মাওলানা মহসিন।

৭৩

বাড়ি পৌঁছুতেই ঘরজুড়ে কান্নার রোল পড়ে যায়। খবর পেয়ে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসে জমির উদ্দীনকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

–জমির সাহেব! আপনাকে আমরা চিনি। আপনার আদর্শ সম্পর্কে জানি। এখানে আপনার কোনো হাত নেই। আপনার ছেলে যা করেছে তার জন্য আমরা কখনই আপনাকে দায়ী করব না। বরং আপনার ছেলের জন্য আপনি জীবনে প্রথম জেল খেঠেছেন, এটা আমরাও মেনে নিতে পারিনি। আপনার জন্য আমাদেরও কষ্ট হয়েছে। সান্ত্বনা দেবো এমন কোনো ভাষা আমাদের নেই। সান্ত্বনা দিয়ে আপনার মনে কষ্ট-যন্ত্রণা আর বাড়াতে চাই না। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ যেন আপনার জন্য উত্তম ফয়সালা রাখেন।

প্রতিবেশীর কথা শুনে জমির উদ্দীন কিছুটা শান্তি পেলেও এলাকা ছাড়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন না। রাতে খাবারের দস্তরখানে বসে এক-দুই লোকমা খেয়ে কী যেন ভাবেন জমির উদ্দীন।

–কী ভাবো? খাও না যে!

স্বামীর কাছে জানতে চান আমেনা বেগম। জমির উদ্দীন কিছু বলতে পারেন না। দুইমাস পর তার সামনে ভালো খাবার। ছেলের জন্য বিনা

দোষে জেল খেটেছেন। অনুতপ্ত আর কষ্টে বুকে ব্যথা ওঠে তার। ঘরের সবাইকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন– আমি তোমাদের একটা কথা বলতে চাই, আশা করি তোমরা কথাটা ফেলবে না।

৭৪

সবাই জমির উদ্দীনের সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হয়। জমির উদ্দীন বলেন, আমি এলাকায় থাকতে চাই না। দিনমজুরি করেই যেহেতু সংসার চলে, যেকোনো জায়গায় গিয়ে দিনমজুরি করা যাবে। মাহিন বাবার কাছে এসে বসে। বাবা তোমাকে আর কোনো কাজ করতে দেবো না। আমিও চাই অন্য এলাকায় চলে যেতে। আর ভালো লাগছে না।

লেখাপড়াও ছেড়ে দেবো। এই লেখাপড়া দিয়ে ভবিষ্যতে কী হবে তা আমি নিশ্চিত নই। কারণ বর্তমান সময়ে উচ্চশিক্ষিত হয়েও বহু যুবক বেকারত্বের অভিশাপে ভুগছে। লেখাপড়া করে ডিগ্রি নিলেও মোটা অঙ্কের বান্ডিল ছাড়া চাকরি হয় না।

মাহিনের কথায় যুক্তি আছে। তাই সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয় ঢাকা চলে যাওয়ার।

স্কুল জীবনের একসিনিয়র বন্ধুকে ফোন করে মাহিন। বহু আগ থেকেই ঢাকায় কোনো একটা কাজ করেন তিনি। বন্ধু জানান, ঢাকায় থাকতে হলে মাসে অন্তত ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ আছে। কিন্তু আয় করা মুশকিল।

মাহিন বলে– বড়ভাই আপনি আমার জন্য একটা বাসা দেখেন, আমার বোন আর মা-বাবাকে নিয়ে যেন থাকতে পারি। ছোট একটা বাসা হলেই চলবে। টাকা যা লাগে ব্যবস্থা করব আমি।

একদিন পর ঐ সিনিয়র বন্ধু মাহিনকে জানান, তোমাদের জন্য একটা বাসা ঠিক করেছি। ভাড়া কম। তোমরা চলে আসতে পারো। কয়েকদিনের মধ্যে সব গুছিয়ে বাড়ির সবাইকে নিয়ে ঢাকায় চলে যায় মাহিনরা। সিনিয়র ঐ বন্ধু ওদের রিসিভ করেন। বাসা বুঝিয়ে দিয়ে চলে যান তিনি। যাবার আগে মাহিনকে বলে যান– দেখো মাহিন! আমি ছোট্ট একটা কারখানায় চাকরি করি। যখন তখন তোমাকে সময় দেওয়া আমার পক্ষে দুষ্কর। তুমি একটা কাজ খুঁজতে থাকো, আমিও চেষ্টা করব।

ঢাকার বাড়ি কাজ পাওয়া সহজ নয়। মা-বাবাকে ঘরে রেখে, জমানো কিছু টাকা দিয়ে একসপ্তাহর বাজার করে মাহিন। একদিন পরই কাজের খোঁজে বের হয় সে। মাহিনের ইচ্ছা শিক্ষাবিষয়ক কোনো কাজের সঙ্গে জড়ানো। একদিন দুইদিন করে সপ্তাহ চলে যায়। ঘরের বাজারও শেষ। এখনও কোনো কাজের সন্ধান মেলেনি। ঢাকার অলিগলি হেঁটে বেড়ায় একটা কাজের আশায়।

৭৫

চলে যায় আরও দু'দিন। এই দু'দিন ঘরের সবাই না খেয়ে আছে। জমির উদ্দীন মাহিনকে বলেন– বাবা তুই আর কত কষ্ট করবি! হাঁটতে হাঁটতে তোর চেহারা কালো হয়ে গেছে।

মাহিনের মাথায় হাত রেখে বলেন– তোর কষ্ট আর সহ্য হয় না। আমাকে তুই নিষেধ করিস না, বাইরে নামলেই দিনমজুরি কাজ পেয়ে যাব। অন্তত ঘরে খাবারের হাহাকারটা তো কমবে!

মাহিন বাবাকে ধরে কেঁদে ফেলে। –বাবা এই বয়সে তুমি কাজ করবে, আর সেই কাজের উপার্জন দিয়ে আমরা পেট পুরে খাব? তা হতে পারে না। চিন্তা করো না বাবা! তোমার দোয়া সঙ্গে থাকলে আমি সত্যিই একটা ভালো কাজ পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।

আমেনা বেগমের সঙ্গে মাহিনের শ্রমের কথা বলে কেঁদে ফেলেন জমির উদ্দীন। সাবিনাও কাঁদে। অসহায় এক পরিবারে রূপ নেয় মাহিনের পরিবার। আমেনা বেগম রাশেদের কথা উঠিয়ে পরিবেশটা আরও আবেগঘন করে তোলেন। রাশেদ কোন বিবেকে প্রবাসীর স্ত্রীকে নিয়ে পালায়? ঐ মহিলার তিনটা বাচ্চা আজ মা-হারা! বাচ্চাগুলোর কথা স্মরণ করে কষ্ট পান আমেনা বেগম। রাশেদের কোনো খোঁজখবর নেই। জমির উদ্দীন স্পষ্ট জানিয়ে দেন– আমার সামনে ওর নামও কেউ নেবে না! আমাদের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই।

সবাই চুপ হয়ে যায় তার কথা শুনে। সন্ধ্যার পর ঘরের বাইরে বেরোয় মাহিন। যে বাড়িটায় ভাড়া থাকে, সেই বাড়ির সামনেই কয়েকটি দোকান রয়েছে। ওখানের একটা চা-দোকানে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বসে

মাহিন। দোকানদারের সঙ্গে নতুন ভাড়াটিয়া হিসেবে পরিচিত হয় আগেই। চা-দোকানীর সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের আলাপ হলেও নিজেদের অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করেনি কখনও। মাহিনের আচরণে চা-দোকানী বেশ আপ্লুত। মাহিনদের ঢাকায় আসার কারণ জানতে চান তিনি। মাহিন অনুপায় হয়ে সবকিছু শেয়ার করে তার সঙ্গে।

৭৬

একটা কাজ দরকার। একসপ্তাহ, দশদিন ধরে ঘুরছি কিন্তু কোনো কাজ পাচ্ছি না। বাবা দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বোন আছে, মা আছেন, তাদের মুখগুলোর দিকে আর তাকাতে পারছি না।

চা-দোকানী জানতে চান মাহিন কী কাজ করতে আগ্রহী। মাহিন বলে– শিক্ষাবিষয়ক কিছু হলে ভালো হয়। তবে আপাতত যেকোনো কাজ হলেও চলবে।

–শিক্ষাবিষয়ক হলে তুমি তো যেকোনো মুহূর্তে কাজে লেগে যেতে পারো। ঢাকায় কোচিং সেন্টারের বেশ চাহিদা। স্কুল-কলেজে লেখাপড়ার মান ভালো না থাকায়, কোচিং সেন্টারের চাহিদা বেড়েছে। মাহিন বলে– কোচিং সেন্টারের জন্য তো অনেক টাকার প্রয়োজন। আমার কাছে এই মুহূর্তে একটা টাকাও নাই।

চা-দোকানী পার্শ্ববর্তী একটি নামীদামী কোচিং সেন্টারের পরিচালকের নাম্বার দেন মাহিনকে। ঐ নাম্বারে ফোন দিয়ে তার কাছে চলে যায় মাহিন। লোকটি খুবই অমায়িক ও ভদ্র মানুষ। একটি কোচিং সেন্টারে যা যা প্রয়োজন, মাহিনকে তার একটি লিস্ট দেন তিনি। কিন্তু সেসব জিনিসপত্র সংগ্রহ করার টাকা নেই মাহিনের কাছে। পরিচালক মাহিনের অবস্থা বুঝতে পারেন। তাই মাহিনকে লক্ষ্য করে বলেন– তোমার আলাদা সেন্টারের প্রয়োজন নেই। তুমি চাইলে আমার এখানেই আলাদা ব্যাচে শুরু করতে পারো। তাতে আমাকে কিছু দিতে হবে না। তোমার ব্যাচে যারা পড়বে, তাদের টাকা তুমিই গ্রহণ করবে। বিকাল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত তোমার ব্যাচটা হতে পারে। যদি কোনোদিন সুযোগ হয় এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে পারো, তখন আলাদাভাবে

একটি সেন্টার করে নেবে।

ঢাকার অপরিচিত শহরের অপরিচিত মানুষদের ভালোবাসায় নতুন জীবন পায় মাহিন।

পরিচালক বলেন– আগামীকাল প্রত্যেক ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের জানিয়ে দেবো, বিকাল ৪টা থেকে আরেকটি নতুন ব্যাচ শুরু হবে। ওরা সব জায়গায় প্রচার করে দেবে। ভালো প্রচার হলে একসপ্তাহ পরই তোমার ব্যাচ শুরু করতে পারবে। আর এই একসপ্তাহ তুমি আমার এখানে সময় দেবে। কীভাবে কোচিং দেওয়া হয়, তার একটা আইডিয়া গ্রহণ করবে।

যা কল্পানাও করেনি, তার থেকে হাজারগুণ বেশি পায় মাহিন। আনুষঙ্গিক আলোচনা শেষে ফিরে আসে সেখান থেকে। ফুরফুরে মেজাজে উপস্থিত হয় চা-দোকানে। মাহিনকে খুশি খুশি দেখে চা-দোকানী আঁচ করতে পারেন সংবাদ ভালো।

–কি? মনে খুব আনন্দ মনে হচ্ছে!

মাহিন আবেগাশ্রু ধরে রাখতে পারে না। বলে– আপনার ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারব না। আপনার ওসীলায় আজ আমার পছন্দের কাজ পেয়েছি। শুধু পছন্দেরই নয়, এমন একজন মহান মানুষের সন্ধান আপনি দিয়েছেন, যার কোনো তুলনা হয় না। হয়ত কোনোদিন ভালো কাজ করেছিলাম– তার উপহার হিসেবে আজ আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য এত সহজ একটা পথ খুলে দিয়েছেন। মাহিনের মুখে সব শুনে চা-দোকানীও অন্তত্য খুশি হন। মাহিন চা-দোকানী থেকে কিছু টাকা ঋণ চায়। দোকানদার মাহিনকে সাধ্যানুযায়ী কিছু টাকা করজেহাসানা প্রদান করেন। মাহিন প্রয়োজনীয় খাবার নিয়ে বাসায় ফেরে। মাহিনের হাতে খাবার দেখে আমেনা বেগম জিজ্ঞেস করেন– কোনো কাজ পেয়েছিস কি বাবা! খাবার পেলি কোথায়? টাকা দিয়েছে কে?

মাহিনের দু'গাল বেয়ে দু'ফোঁটা আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে– আগে সবাই খাবার খেয়ে নাও, পরে সব খুলে বলছি।

খাবার খেতে খেতে মাহিন ঘটে যাওয়া সব ঘটনা খুলে বলে। সব শুনে আল্লাহ তাআলার দরবারের শুকরিয়া আদায় করেন তারা এবং চা-দোকানী ও কোচিং সেন্টারের পরিচালকের জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করেন।

৭৭

প্রতিদিনের ন্যায় ছাত্রদের পড়ান মাওলানা মহসিন। ঠিক এমন সময় পার্শ্ববর্তী এলাকার একজন ব্যক্তি আসেন তার কাছে– হুজুর আপনার সঙ্গে একান্ত কিছু কথা বলতে চাই।

মাওলানা মহসিন ক্লাস শেষ করে লোকটির সঙ্গে বসেন। লোকটি বলেন– আমি আপনার কাছে একটা তাবিজের জন্য এসেছি।

–কিসের তাবিজ? কার কী হয়েছে?

লোকটি বলেন– আমার একমাত্র মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কেউ যেন আমার মেয়েকে ক্ষতি করতে না পারে। ও যেন সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে চলাফেরা করতে পারে, তার জন্য একটা তাবিজ চাই।

–আমি তো তাবিজ লিখতে জানি না, কীভাবে দেবো!

তবুও লোকটি অনেক পীড়াপীড়ি করে একটা তাবিজের জন্য। কিন্তু মাওলানা মহসিন তাবিজ বিষয়ে অভিজ্ঞ নন। লোকটি মন খরাপ করে চলে যেতে চাইলে মাওলানা মহসিন তাকে ডেকে বসান।

–আপনাকে দেখে খুব বেশি চিন্তিত ও অসহায় মনে হচ্ছে। আপনার মেয়ের কী হয়েছে তা বলা যাবে?

–যা হয়েছে তা বলে কী লাভ। যা হারিয়েছি তা কি আর ফিরে পাওয়া যাবে? একটিমাত্র মেয়ে আমার। এখন শুধু ওর হারিয়ে যাওয়া সেই হাসি মুখটা ফিরে পেতে চাই। আর কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই। এই কথা বলেই হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেন লোকটি। মাওলানা মহসিন অনুরোধ জানান পুরো ঘটনা খুলে বলতে। লোকটি বলতে শুরু করেন– আমার বিয়ের বহু বছর পর আল্লাহ আমাদের সংসারে ফুটফুটে একটি কন্যা সন্তান দান করেন। অনেক চেষ্টা তদবীরের পরও আর কোনো সন্তান হয়নি আমাদের। ফলে সব শখ-আহ্লাদ ও স্বপ্ন মেয়েটিকে নিয়েই ছিল। দেখতে দেখতে যখন ওর বয়স পাঁচবছর হয়, ওকে স্কুলে ভর্তি করাই। ওর মেধাশক্তি খুবই ভালো। আমি নিজে ওকে স্কুলে নিয়ে যেতাম এবং নিয়ে আসতাম। আমাকে ছাড়া মেয়েটা কিছু বুঝত না। ওর মা এ নিয়ে মাঝে মাঝে হিংসা করে বলত– মেয়ে আমার গর্ভে নয়, মনে হয় আপনার গর্ভে হয়েছে। মেয়ে শুধু আপনার কথাই বলে। আপনি বাসায় ফিরতে দেরি হলে, পথ চেয়ে বসে থাকে। আপনাকে ছাড়া খেতে চায় না। আপনাকে না দেখলে নাকি ওর ভালো লাগে না।

মেয়েরা সম্ভবত একটু বেশিই বাবাপাগল হয়। বাবারাও মেয়েদের একটু বেশিই ভালোবাসেন। বাবার ভালো-মন্দের দিকে খেয়াল রাখা মেয়েদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। মেয়েরা মনে করে বাবার অভিভাবক তারাই। বাবার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিতে পারে মেয়েরা। আবার মেয়ের মুখের দিকে তাকালে বাবারাও জীবনের সমস্ত কষ্ট ভুলে যান। সারাদিনের ক্লান্তি শেষে ঘরে ফিরলে- মেয়েরা যখন বাবা বাবা বলে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে, মুহূর্তেই সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।
রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কন্যাসন্তান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মা-বাবার প্রতি বিশেষ হাদিয়া। যার তিনটি মেয়ে, তিনি জান্নাতের মালিক। বাবার কাছে মেয়েরা অমূল্য সম্পদ।

৭৮

ছোটসময় আমার মেয়েকে আমি গোসল করাই। খাইয়ে দিই। ও আমার পাশেই ঘুমোয়। ৬-৭ বছর হওয়ার পর আমি ওকে আর গোসল করাইনি। আমার পাশে ঘুমুতেও দেয়নি। তবে খাইয়ে দিয়েছি। মেয়েটা আমার হাতে না খেলে নাকি ওর পেটই ভরে না। দেখতে দেখতে মেয়েটা কখন যে বড় হয়ে যায় টেরও করতে পারিনি।
চারদিক থেকে ওর বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে। আমি ও মেয়ের মা বসে পরামর্শ করি ওর বিয়ের বিষয়ে। সমাজের যা অবস্থা- তাতে বিয়ে দেওয়াটাই অনেক ভালো। দু'জনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাত্র খোঁজতে শুরু করি। কয়েকদিনের মাথায় ভদ্র ও বিনয়ী একজন পাত্র পেয়েও যাই। ছেলেটি বেশ শিক্ষিত। ওদের আর্থিক অবস্থাও ভালো। সামাজিক অবস্থান সম্মানজনক। আমরা উভয়পক্ষ বসে বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করি।
সবকিছু প্রস্তুত। বহু মেহমান দাওয়াত করেছি। একমাত্র মেয়ের বিয়ে বলে কথা। লাখটাকার ওপর খরচ। খাবার-দাবার প্রস্তুত। কিন্তু হঠাৎ এক কালবৈশাখী ঝড় হামলে পড়ে আমাদের ওপর। কেড়ে নেয় আমাদের সবকিছু।

প্রশাসনের একদল লোক আসে আমাদের বাড়ি। তারা আমার মেয়ের বয়স জানতে চান। আমি বলি– আমার মেয়ের বয়স ১৬ বছর। তাদের একজন বলেন, আপনার মেয়ে তো সাবালিকা হয়নি। তার এমন আজগুবি কথায় আমি যেন আকাশ থেকে পড়ি। সাবালিকা হওয়া কি কেউ আটকে রাখতে পারে? আল্লাহ তাআলা ছেলে এবং মেয়েকে নির্দিষ্ট সময়ে যৌবনে পদার্পণ করান।

আমি অফিসারকে বলি, আমার মেয়ে তো সাবালিকা হয়েছে। আপনি কীভাবে জেনেছেন আমার মেয়ে সাবালিকা নয়? অফিসার বলেন, দেশীয় আইনে ১৮ বছরের আগে মেয়েরা সাবালিকা হয় না। প্রশাসনিক টিমে ২-৩ জন মহিলাও ছিলেন। তারা আমার মেয়েকে বলেন, তুমি কি জানো না বাল্যবিবাহ দণ্ডনীয় অপরাধ? আমার মেয়ে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। ভরা মজলিসে কেউ প্রতিবাদ করেনি। সবাই আস্তে আস্তে উঠে উঠে চলে যায়!

আমার দাঁড়িয়ে কাঁদা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কলিজার টুকরা মেয়ের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে দেশীয় আইনের ফাঁদে পড়ে। আমার মেয়ের জীবন ধ্বংস হতে চলছে, বাবা হয়ে আমি কীভাবে তা সহ্য করি! মহিলা অফিসার আমার মেয়েকে বলে, ১৮ বছর পূর্ণ হলেই তুমি বিয়ে করবে। এর আগে প্রয়োজন হলে পছন্দের ছেলের সঙ্গে প্রেম করবে, সময় কাটাবে! তাতে মন ভালো থাকবে! আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি ঐ মহিলা অফিসারের দিকে। একজন নারী একটা মেয়ের বিয়ে ভেঙে দিয়ে অবৈধ সম্পর্কের দিকে উৎসাহিত করে! কল্পনাও করিনি আমাদের সমাজ নৈতিকতা হারিয়ে আজ এতটা নিচে নেমেছে।

৭৯

কিছুক্ষণ পর মেয়ের স্কুলের একদল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাও উপস্থিত হন আমার বাড়ি। তারাও প্রতিবাদ জানান বাল্যবিবাহের। অফিসাররা শিক্ষকদের তাগিদ দিয়ে বলেন– তারা যেন ক্লাসে বাল্যবিয়ের অপকারিতা বর্ণনা করেন এবং ছেলে-মেয়েদের প্রেমের প্রতি উৎসাহিত করেন! আমি অফিসারদের কাছে জানতে চাই– তাদের

মেয়ে অন্য ছেলের সঙ্গে যদি প্রেম করে, সেটা তারা মেনে নেবেন কী না? আমাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেন তারা! আমার মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে ঘরের ভেতর চলে যায়। কাজী, বর, বরের বাবা এবং আমাকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। থানায় নিয়ে একটা লিখিত রেখে ছেড়ে দেয় আমাকে।

মাওলানা মহসিন জানতে চান– কী লিখিত নিয়েছেন তারা?

লোকটি আবার বলতে শুরু করেন– 'মেয়ের প্রতি আমার কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। ১৮ বছরের আগে মেয়েকে বিয়ে দিলে আমার কঠিন শাস্তি হবে। মেয়েকে স্কুলে পড়াতে হবে, ঘরে বসিয়ে রাখা যাবে না। মেয়েরা এখন স্বাবলম্বী হচ্ছে, নিজ পায়ে দাঁড়াচ্ছে, কারও অধীনে থাকছে না, মেয়েদের এখন সমান অধিকার এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নে নারীরা সমান অংশীদার হবে'।

শেষের কথাটা শুনে ভালোই লেগেছে। নারীরা যদি দেশের উন্নয়নে অংশীদারই হয়, সেটা খারাপ কী! তাই বলে মেয়ের ওপর বাবার কর্তৃত্ব থাকবে না? বাবা হয়ে মেয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথ বন্ধ করে দেয় ঐ লিখিত কাগজ। অপদার্থ ও ব্যর্থ বাবার মতো বাড়িতে এসে মাথা গুঁজে রয়েছি বহুদিন। হাজার হাজার টাকার খাবার নষ্ট হয়েছে সেদিন। কেউ খেতে পারেনি। নষ্ট হয়ে পচা দুর্গন্ধে পরিণত হয় খাবারগুলো। এই ভেবে কষ্ট পেয়েছি যে, কত গরিব মানুষ দাওয়াত দিয়েছি, যারা একমুঠো খাবারের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। তাদের কপালেও সেদিন খাবার জোটেনি। সেদিন তারা অনেক আশা নিয়ে বিয়ে বাড়িতে এসেছিল, কিন্তু...

আর বলতে পারে না লোকটি। কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে। চাপা কান্না আর বুকভরা যন্ত্রণা কুড়ে কুড়ে খায় তাকে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলতে শুরু করেন তিনি– সেদিন অনেক এতিম, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত শিশু বিয়ে বাড়িতে জড়ো হয়ছিল। আমিই খুঁজে খুঁজে ওদের দাওয়াত করি। বাড়ির পাশেই একটি এতিমখানা রয়েছে। ওখানের সব এতিম শিশুদেরও নিয়ে আসি। কিন্তু খালি মুখে চলে যেতে হয় বাচ্চাগুলোর।

একমাস ঘর থেকে বের হয় না মেয়েটা। মেয়ের মা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেয়। আমি নিজেও একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে বেরোই না। বিয়ের পর আমাদের সন্তান হয় না। অনেক চেষ্টা-তদবিরের পর আল্লাহ পাক উপহার হিসেবে দান করেন ওকে। সে সন্তানের জীবনে এতবড় ধাক্কা আমাদের কুড়ে কুড়ে খায়। একমাস পর স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক ওকে স্কুলে যেতে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। আমরাও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে স্কুলে যেতে রাজি করি। যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন অন্তত লেখা-পড়াটা নষ্ট করে লাভ কী!

এভাবে বছরদুই কেটে যায়। আমরা আবার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। কারণ এখন আর আইনের বাধা নেই। ওর বয়স ১৮ পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু মেয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, সে বিয়ে করবে না। আমরা জোরাজুরি করলে উত্তরে বলে, 'আমার বয়স এখন পূর্ণ ১৮। আমার সিদ্ধান্ত আমিই নেবো! দেশের আইনানুযায়ী আমাকে কিছু বলার বা নিয়ন্ত্রণের অধিকার তোমাদের নেই'!

আমরা মেয়ের কথায় হতাশ হইনি। কারণ বিয়ে ভাঙার পর মেয়েটা একটু বদমেজাজী হয়ে পড়ে। কোনোকিছুর ব্যাপারে জোরাজুরি করলে উল্টাপাল্টা বলে। দুইবছরে ওর মুখে কোনো হাসিও দেখিনি। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিই- সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত মেয়ের বিয়ে নিয়ে কোনো কথা বলব না।

কিন্তু এ কেমন আইন? ১৮ বছরের আগে মা-বাবা চাইলে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারবে না, আবার ১৮ বছরের পরও মা-বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী মেয়েকে বিয়ে দিতে পারবে না! এ কেমন আইন? যে আইন মেয়ের ওপর থেকে মা-বাবার অধিকার কেড়ে নেয়!

৮১

ধীরে ধীরে মেয়েটা পরিবর্তন হতে থাকে। চলাফেরা ও কথাবার্তায় উৎফুল্লতা লক্ষ্য করি। খিটখিটে মেজাজ থেকে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হতে শুরু করে। ওকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে দেখে আমাদের যা আনন্দ লাগে তা বলে বুঝাতে পারব না। একদিন বিকেলে বাসায় ফিরে বেশ হাসিখুশি ছিল মেয়েটা। ওর হাসিতে যেন পুরো পৃথিবী হাসে। আমরা যেন নতুন করে ফিরে পাই ওকে। মনে হয়, আকাশের চাঁদ নেমে এসেছে আমাদের ঘরে। দুইবছর যে মেয়ের মুখে হাসি দেখিনি, সে মেয়ে আজ হাসছে, খেলছে, কথা বলছে। ওর হাস্যোজ্জ্বল মুখটা দেখে মনে হয়েছে- অতীতে কোনো দুঃখই ছিল না আমাদের। আমরা ওর হাসির কারণ জিজ্ঞেস করিনি। শুধু উপভোগ করেছি। এভাবে চলে যায় আরও একবছর।

একবছর পর হঠাৎ একদিন ক্লাস থেকে ফিরে চিৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। আমরা অনেক চেষ্টা করি দরজা খোলার, কিন্তু ও দরজা খোলে না। শুধু কেঁদেই যায়। কিছুক্ষণ পর কান্নার শব্দ বন্ধ! আমরা ভয় পেয়ে যাই। কী হলো কিছুই বুঝে ওঠতে পারিনি। দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে দেখি ও আত্মহত্যার চেষ্টা করছে! মেয়ের মা বেহুশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আমি আল্লাহর দয়ায় মেয়েকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট হই। জানতে চাই কী হয়েছে। একবছর তোমাকে কত হাসিখুশি দেখেছি, আজ হঠাৎ তুমি একেবারে মৃত্যুর পথ বেছে নিলে!

ও বলে, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবা! বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর আমি নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ক্লাসে দৈনিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রেম-ভালোবাসার গল্প শুনতে শুনতে প্রেমের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ি। ক্লাসে আসা-যাওয়ার পথে একটা ছেলে আমাকে ডিস্টার্ব করত। কিন্তু একসময় ঐ ছেলের প্রতিই দুর্বল হয়ে পড়ি। ভালোবেসে ফেলি ওকে। তোমরা আমাকে দেখেছ দৈনিক ক্লাসে যেতে, কিন্তু তা করিনি। ক্লাসের নাম করে প্রেমিকের সঙ্গে পার্কে-বাগানে নিয়মিত ঘুরে বেরিয়েছি আমি। ওর ভালোবাসায় পাগল হয়ে যাই। তোমাদের কাউকে কিছু জানাইনি।

৮২

মাওলানা মহসিন অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন লোকটির দিকে। লোকটি একটু জিরিয়ে আবার বলতে শুরু করেন– মেয়েটা যে এতকিছু করেছে তা মোটেও আঁচ করতে পারিনি আমরা।

মাওলানা মহসিন নড়েচড়ে বসেন– এতকিছু হয়ে গেলো অথচ আপনারা টেরই পাননি! আচ্ছা তারপর কী হলো?

জানতে চান মাওলানা মহসিন। লোকটি বলতে থাকেন– মেয়ের মা যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, সে খবরও ছিল না আমার। মেয়ের মা'র মাথায় তেল-পানি দিয়ে জ্ঞান ফিরাই। জ্ঞান ফিরতেই মেয়েকে জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করে সে। মেয়ের আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার কারণ এখনও জানে না মেয়ের মা। আমি মেয়ের মাকে বলি– কান্নাকাটির কিছু নেই। আগে শোনো কী হয়েছে। মান-সম্মান যা ছিল তাও শেষ এবার! আমার স্ত্রী মেয়ের কাছে জানতে চায় কী হয়েছে। কিন্তু মেয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরে আমিই বলে দিই কী হয়েছে। আমার স্ত্রী সব শুনে আবার অজ্ঞান হওয়ার উপক্রম।

মেয়ের কাছে তারপরের ঘটনা জানতে চাই। কিন্তু এরপর ও যা শুনায়, তা শোনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না আমরা।

ও বলে– শেষের একমাস থেকে ঐ ছেলের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে! ঘটনার দিন ঐ ছেলে ওকে প্রস্তাব দিয়েছে, ওর বন্ধুদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে! মেয়ে রাজি না হওয়ায় ছেলেটা ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

৮৩

কথার ফাঁকে ফাঁকেই ডুকরে কেঁদে ওঠেন লোকটা। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলতে শুরু করেন– লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে একনাগাড়ে বলে যায় আমার মেয়ে! ওর কথা শুনে পায়ের নিচের মাটি সরে যায় আমার। নিরুপায় হয়ে ঐ ছেলের কাছে যাই। অনুরোধ জানাই আমার মেয়েকে বিয়ে করার। ছেলেটা উল্টো আমাকে মেয়ের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কের

ভিডিও ভাইরালের হুমকি দিয়ে বলে, আমার মেয়েকে যেন ওর কাছে পাঠিয়ে দিই! নাহয় অনলাইনে ভিডিও ছেড়ে দেবে! আমি লজ্জা-ঘৃণায় কাঁপতে থাকি।

মেয়ের মা আমাকে থানায় যাওয়ার পরামর্শ দেয়। আমি তাৎক্ষণিক থানায় যাই। ওসির কাছে বিস্তারিত বর্ণনার পর ছেলের নামে মামলা করতে বলেন তিনি। আমি ওসি সাহেবকে বুঝাবার চেষ্টা করি, মামলা হলে জানাজানি হবে। এতে মেয়েটার আরও বড় সর্বনাশ হবে। বরং ঐ ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করুন মেহেরবানী করে। ওসি বলেন, আপনার মেয়ের সঙ্গে ঐ ছেলের শারীরিক সম্পর্ক জোর করে হয়নি, হয়েছে দু'জনের সম্মতিতেই। এখানে আমার কিছু করার নাই!

ধিক্কার দিয়ে পুলিশকে বলি– আপনারা আমার মেয়ের জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছেন। আপনাদের আইন আজ আমার মেয়ের জীবনটা তছনছ করে দিয়েছে। সেদিন আপনারা আমার মেয়ের বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন, কিন্তু আজ জোড়া লাগাতে অক্ষম। এই বলে থানা থেকে বেরিয়ে আসি। কারও কাছে বিচার পাইনি। আজ ৬ মাস মেয়েটা ঘরের মধ্যে পাগলের মতো ব্যবহার করছে।

দীর্ঘ সময় ধরে লোকটির কথা শোনেন মাওলানা মহসিন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাওলানা মহসিন বলেন– আপনার মেয়েকে কোনো মহিলা মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দিন। হয়ত একদিন সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

মাওলানা মহসিন থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান তিনি।

মাওলানা মহসিন মনে মনে ভাবেন- বিবাহপূর্ব প্রেমের সম্পর্ক এভাবেই ছেলে-মেয়েদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এসব সম্পর্ক কখনও আন্তরিকতাপূর্ণ হয় না, হয় যৌনতার লালসা থেকে। এসব সম্পর্কের মূল উপাদান হলো রূপ। আর যে সম্পর্ক রূপ দেখে গড়ে ওঠে- তার শেষ পরিণতি রূপভোগ। রূপের ভোগ শেষে ছুঁড়ে ফেলে। রূপের সম্পর্ক যৌনতার সঙ্গেই জড়িত।

মাওলানা মহসিনের কর্মজীবন একরকম চলে যাচ্ছিলো। অনেকদিন পর হঠাৎ ঐ লোকটি এসে আবার হাজির হন মাওলানা মহসিনের মাদরাসায়। মাওলানা মহসিন লোকটিকে আগ্রহের সঙ্গে রিসিভ করেন। জানতে চান তার মেয়ের খবর কি? লোকটি আনন্দচিত্তে মাওলানা মহসিনকে জানান– আপনার পরামর্শে আমার মেয়েকে মাদরাসায় ভর্তি করিয়েছি। ও অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে।

আপনার জন্য কিছু হাদিয়া নিয়ে এসেছি। আপনাকে বিনিময় হিসেবে কিছুই দিতে পারিনি, তবে আমার মেয়ের হাতে বানানো হাদিয়াটা গ্রহণ করবেন। ও নিজ হাতে আপনার জন্য পিঠা বানিয়ে পাঠিয়েছে।

মাওলানা মহসিন বেজায় খুশি। একটা বিপথগামী মেয়ে তার পরামর্শে আজ দীনের পথে এসেছে। এ আনন্দের কোনো সীমা থাকার কথা নয়। মাওলানা মহসিন লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলেন– আমাকে কোনো বিনিময় দিতে হবে না, শুধু দোয়া করলেই হবে।

আসলে দীনি শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এই দীনি শিক্ষা আছে বলেই এখনও কিছুটা ভদ্রতা সভ্যতা অবশিষ্ট আছে। দীনি শিক্ষা মানুষের ভেতরের পশুত্বকে বের করে মনুষ্যত্ব ঢুকিয়ে দেয়। অন্যদিকে দুনিয়ার লোভ, নারী আসক্তি ও অন্যায় কাজ মানুষের ভেতরের মনুষ্যত্বকে বের করে পশুত্ব ঢুকিয়ে দেয়। এজন্য ছেলে-মেয়েদের দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা অত্যন্ত জরুরি।

অন্তত পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত নূরানী বা কেরাতুল কোরআনের সিলেবাস শেষ করার পর ছেলে-মেয়েদের স্কুলে দেওয়া উচিৎ। এতে সামাজিক চারিত্রিক অবক্ষয় রোধ হবে। নাহয় যেভাবে ছেলে-মেয়ে বিবাহপূর্ব অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে, তাতে আস্তে আস্তে সমাজ ধ্বংসের পথে এগোবে। সভ্যতা ভদ্রতা হারিয়ে যাবে।

বিবাহপূর্ব সম্পর্ক সবকালেই হারাম। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে তা মহামারি আকার ধারণ করেছে। বর্তমান সময়ের অবৈধ প্রেম যৌনতা ছাড়া যেন চলেই না! মাদক ছাড়া বর্তমান সময়ের প্রেম পূর্ণতাই পায় না!

৮৫

মাওলানা মহসিন প্রতিদিনের ন্যায় ছাত্রদের ক্লাস নিচ্ছেন। হঠাৎ সাবিনার ফোন। বেশ কয়েকদিন যোগাযোগ নেই সাবিনার সঙ্গে। নিজেও সময় করে ফোন দিতে পারেননি। সালাম বিনিময় হয়– কেমন আছো তুমি?

সাবিনার কাছে জানতে চান মাওলানা মহসিন। এতদিন মাওলানা মহসিনের কাছে যা গোপন রাখে সাবিনা, তা আজ প্রকাশ করে দেয়।

–আমরা ঢাকা চলে এসেছি।

–কেন কী হয়েছে?

–সরাসরি বলব। আপনি যদি ঢাকা আসতেন খুব খুশি হতাম। বাবা দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আমরা এখন অসহায় এক পরিবারে রূপ নিয়েছি।

পরকীয়া একটা পরিবারকে কীভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ রাশেদ। পরকীয়ার মতো মহাব্যধি শুধুমাত্র পর্দাহীনতারই কুফল। শরিয়ত সমর্থিক যৌক্তিক প্রয়োজন ব্যতিত নারী-পুরুষের কথোপকথন বৈধ নয়। তাও পর্দা-সহকারে হতে হবে। পবিত্র কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী দিয়েছেন। পর্দানশীন পরিবারে পরকীয়ার নজির নেই। পর্দানশীন পরিবার আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহানেয়ামত।

৮৬

পরদিন বাসার বাইরে পায়চারি করে মাহিন। আজ মনটা বেশ ফ্রেশ। একটা কাজ হয়ে গেছে। কিছু ভালো মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়। ভাবতেই ভালো লাগে মাহিনের। ঢাকার অপরিচিত ব্যস্ত শহরে ভালো মানুষের দেখা মেলা ভার। তাই নিজেকে হাল্কা লাগে তার।

এর মাঝে হঠাৎ মোবাইল বেজে ওঠে। মাসনার ফোন। নানা ব্যস্ততা আর পারিবারিক ঝড়ে মাসনার কথা একপ্রকার ভুলেই যায় মাহিন। এতদিন মাসনাও মাহিনকে ফোন করেনি। মোবাইল রিসিভ করতেই অভিমানী কণ্ঠে মাসনা বলে– এভাবে ভুলে রইলে আমাকে? চৈতি

তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, কিন্তু বাড়িতে নাকি তালা লাগানো। কোথায় গিয়েছো তোমরা? আমাকে না বলে চলে গেলে? তুমি জানো না, তোমাকে না দেখে থাকতে পারি না আমি। অপেক্ষায় ছিলাম তোমার ফোন আসবে। কিন্তু একবারও ফোন করোনি। বাবা চান আমার বিয়ে হয়ে যাক। কী করব বুঝতে পারছি না। একনাগাড়ে বলতে থাকে মাসানা।

–আমরা বড় সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ঢাকা চলে এসেছি। তোমাকে বলার সুযোগ হয়নি। ঢাকায় একটি কোচিং সেন্টারে কাজ হয়েছে আমার। আমরা এখন থেকে ঢাকায়ই থাকব।

–তাহলে আমার কী হবে? তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না আমি। আমাকেও নিয়ে যাও!

–তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে আলাপ করো। দেখো তারা কী বলেন।

–তারা রাজি হবেন না। আমি ইঙ্গিতে তাদের কিছুটা বুঝিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের স্পষ্ট কথা, তারা নাকি ছেলে ঠিক করে রেখেছেন, সেখানেই আমার বিয়ে হবে। এ বিয়ে আমি মেনে নিতে পারব না বলে অঝোরধারায় কাঁদতে শুরু করে মাসনা।

–এই মুহূর্তে কী করে তোমাকে নিয়ে আসব। নিজেদের থাকারই তো জায়গা নেই।

–এমন কী হয়েছে, যে কারণে তোমরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে?

–বড়ভাই রাশেদের একটা অনৈতিক কাজের কারণে আমরা এলাকা ছেড়েছি। আমার বাবা দুইমাস জেল খেটেছেন।

মাসনা আক্ষেপ করে বলে– এতকিছু ঘটে যাওয়ার পরও তুমি আমাকে কিছুই জানালে না! আমাকে কি এখনও তোমার সুখ-দুঃখের সঙ্গী ভাবতে পারোনি! আমি কি তোমার আপন কেউ নই? আমি জানলে কি তোমাকে ছেড়ে চলে যেতাম? তোমার ভাই যা কিছুই করুক না কেন, সেখানে তোমার বা তোমার বাড়ির কারও তো দোষ নেই!

যাহোক, তুমি দ্রুত আমাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো। আমি তোমাকে ছাড়া আর কারও ঘর করতে পারব না। অন্য কারও ঘরে যাওয়া লাগলে আমাকে আর পাবে না। পৃথিবী ছেড়েই চলে যাব।

৮৭

মাওলানা মহসিন বুঝতে পারেন, সাবিনাদের নিশ্চয়ই বড় কোনো সমস্যা হয়েছে, যা খুলে বলছে না সে। তাই মাদরাসা কমিটির সঙ্গে ঢাকা যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেন তিনি। কমিটির সভাপতি ঢাকা যাওয়ার ব্যাপারে মত প্রদান করেন। সভাপতি থেকে একমাসের অগ্রিম বেতন নিয়ে ঢাকায় যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন মাওলানা মহসিন।

এদিকে সাবিনাও ঘরের কাউকে জানায়নি যে, মাওলানা মহসিনকে ঢাকায় আসতে বলেছে। মাওলানা মহসিন সাবিনা থেকে ঢাকার ঠিকানা নিয়ে পরদিন সন্ধ্যার গাড়িতে ঢাকায় রওয়ানা হন।

ঠিক ফজরের আগ মুহূর্তে কে যেন দরজায় কড়া নাড়ছে। জমির উদ্দীন দরজা খোলেন।

–এ কী! জামাই বাবাজি!! তুমি কোত্থেকে? ঠিকানাইবা পেলে কোথায়? কথার শব্দ পেয়ে আমেনা বেগমও দরজায় এসে দাঁড়ান। মাওলানা মহসিনকে দেখে তিনিও আশ্চর্য হন– মেহমানকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে? আগে ঘরে ঢোকতে দাও! পরে সব শোনা যাবে; বলেন আমেনা বেগম।

সাবিনা নামাযের বিছানায়। সে তো আগ থেকেই জানে মাওলানা মহসিন আসবেন। তবে প্রিয়তম স্বামী যে ইতোমধ্যেই পৌঁছে গেছেন তা টের পায়নি সাবিনা। সামনের ঘরে কথার শব্দ পেয়ে বুঝতে পারে প্রিয় মানুষটি এসে গেছেন।

৮৮

মাহিন চিন্তায় পড়ে যায় মাসনাকে নিয়ে। সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে এই মুহূর্তে কী করবে। মা-বাবাকেও এসব জানানো সম্ভব নয়। বিষয়টি স্পর্শকাতরও। বড়ভাই যা করেছেন, তার মাঝে আমার সম্পর্কের কথা জানলে ভীষণ কষ্ট পাবেন তারা। উপায় না পেয়ে সাবিনার সঙ্গে আলাপ করে মাহিন। কিন্তু সাবিনা সরাসরি জানিয়ে দেয়– ভাইয়া তুই এই সম্পর্ক ছেড়ে দে। আমি বুঝে গেছি এসব সম্পর্কে শান্তি নেই।

কিন্তু মাহিনের মন মানে না। মাহিনের মনে-প্রাণে যে শুধুই মাসনা।

ওদিকে মাসনাকেও তার বাবা বিয়ের জন্য চাপ দেয়।
সাবিনার কাছে ঠাঁই না পেয়ে সেই কোচিং সেন্টারের পরিচালকের কাছে চলে যায় মাহিন। যদিও একদিনের পরিচয়, তবুও পরিচালকের ব্যবহারে তার কাছে নিজের দুঃখ শেয়ার করার মতো ভরসা পায় মাহিন। সবকিছু শুনে পরিচালক বলেন–
প্রেম? সে তো ভালো কাজ! এতে কোনো অন্যায় নেই। তুমি যদি চাও, তাহলে মাসনাকে নিয়ে আসতে পারো। তোমাদের আলাদা থাকার জায়গা করে দেবো আমি। কারণ প্রেমজুটির সহযোগিতা করতে পারাও পুণ্যের কাজ।
পরিচালকের আশ্বাসে ভরসা পায় মাহিন। মাসনাকে ফোন করে আর কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরার অনুরোধ জানায় সে। যত দ্রুত সম্ভব কোনো একটা ব্যবস্থা করে ফেলব।

দীনি জ্ঞান না থাকায় এসব পরিচালকরা পশ্চিমা সংস্কৃতিকে জীবন সাফাল্যের মাপকাঠি ধরে নিয়েছে। নষ্টপ্রেমের করুণ পরিণতি দেখার পরও পার্থক্য করতে পারেন না, কোথায় সুখ আর কোথায় দুঃখ।
সমাজের ভদ্রবেশি কিছু মানুষ বাস্তবতা জানার পরও কোচিং পরিচালকের মতোই প্রেমের সহযোগিতার নামে এভাবে যুবক-যুবতীর জীবন ধ্বংসের পথে ঠেলে দেন। তাদের লেখা, বলা ও গল্প-উপন্যাসে বিবাহপূর্ব প্রেমে কোনো দোষ নেই বলেই প্রচার করেন! তাই প্রেমের পক্ষে সবসময় তাদের উদারতা উগ্রে পড়ে!

৮৯
ঘরে ঢুকে বসেন মাওলানা মহসিন। বসার তেমন উপযুক্ত জায়গা নেই। ছোট্ট দুইটা রুম। এর মাঝেই ভাগাভাগি করে থাকে মাহিনরা।
মাওলানা মহসিনকে দেখে সাবিনা কেঁদে ফেলে। মাওলানা মহিসন সাবিনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। সাবিনার কান্না ও মাওলানা মহসিনের সান্ত্বনা দেখেই জমির উদ্দীন বুঝতে পারেন, মেয়ের জামাই ঢাকায় কেন এসেছে। সাবিনা বাবা-মাকে লক্ষ্য করে বলে– আমাদের

এই কঠিন বিপদে আমিই তোমাদের জামাইকে আসতে বলেছি।
–আপনাদের এই বিপদের সময় আমি যদি পাশে না থাকি, তাহলে কে থাকবে? আপনারা ঘাবড়াবেন না। বেশ ক'দিনের ছুটি নিয়ে ঢাকায় এসেছি, ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে; বলেন মাওলানা মহসিন।
ফজরের নামায আদায় করে চা-নাস্তার ব্যবস্থা করে সাবিনা। নাস্তার দস্তারখানে বসে আলোচনা করেন তারা। মাওলানা মহসিন সাংসারিক যাবতীয় হালচাল জানতে চান। জমির উদ্দীন বলেন– তোমার দোয়ায় গতরাতে মাহিনের একটা কাজ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।
মাহিনের কাজের কথা শুনে মাওলানা মহসিন আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন।
যে টাকাগুলো সঙ্গে নিয়ে আসেন, সেগুলো শ্বশুর জমির উদ্দীনের হাতে দিয়ে বলেন– এটা আপাতত রাখুন! আমার পক্ষ থেকে হাদিয়া।
জমির উদ্দীন টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানান।
–আচ্ছা ঠিক আছে, মাহিন ভাইর রোজগার শুরু হলে নাহয় ফেরৎ দেবেন! তবুও এখন এটা আপনাকে নিতে হবে।
মাওলানা মহসিনের অনুরোধে টাকাটা গ্রহণ করেন জমির উদ্দীন।
জমির উদ্দীন আমেনা বেগমকে লক্ষ্য করে বলেন– আল্লাহ তাআলা মাওলানা মহসিনের মতো একটা ছেলে উপহার হিসেবে দান করেছেন আমাদের। অথচ নিজের ছেলের পরিচয় দিতেও লজ্জা পাই!
মাওলানা মহসিন তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন– আপনারা দোয়া করলে বড়ভাই তার ভুল বুঝতে পেরে সঠিক পথে ফিরে আসবেন ইনশাআল্লাহ।
–ওর নাম নিও না বাবা! ছোট থেকে ও আমাকে এভাবে জ্বালাতে জ্বালাতে এসেছে। কত জায়গায় ওর জন্য অপমানিত হয়েছি! ওকে আর পরিচয় দেবো না; বলেন জমির উদ্দীন।

মাওলানা মহসিন জানতে চান, রাশেদ যেই মহিলাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে, তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছেন কী না। উত্তরে সাবিনা বলে– এ সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

–যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন পূর্বের স্বামী থেকে তালাক এনে ইদ্দত পালন করে নতুনভাবে আকদ করতে হবে। নাহয় তাদের মাঝে আজীবন ব্যভিচার হতে থাকবে। আগের স্বামী তালাক না দিলে কোনোভাবেই বড়ভাইর জন্য ঐ মহিলা হালাল হবে না; বলেন মাওলানা মহসিন।

–তবে সে এই রুচিহীন ও অনৈতিক পথে না গেলেও পারতেন। প্রয়োজনে আরেকটি বিয়ে করতেন।

আরেকটি বিয়ের কথা শুনে সাবিনা ক্ষেপে ওঠে মাওলানা মহসিনের ওপর– কী বলছেন আপনি? একজন পুরুষ কয়টা বিয়ে করে?

–আমাদের সমাজে একাধিক বিয়ে কঠিন হওয়াতেই পরকীয়া বেড়েছে। অথচ ইসলামে একজন পুরুষ একইসঙ্গে চারজন স্ত্রী রাখতে পারেন। আমাদের দেশে দ্বিতীয় বিয়ে করলে তাকে অপরাধ ও ঘৃণার চোখে দেখা হয়। অথচ এটা মোটেই উচিৎ নয়। বরং স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ বা ন্যায়পরায়নতা ঠিক রাখতে পারলে, পুরুষের জন্য একাধিক বিয়ে আরও ভালো। বিয়ে যত কঠিন হবে ব্যভিচার ও পরকীয়া তত সহজ হবে। হয়ত দ্বিতীয় বিয়ে কেউ মেনে নেবে না ভেবেই রাশেদ পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। যদিও পরকীয়া সমর্থন করার নুন্যতম সুযোগ নেই। প্রয়োজনমাফিক দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়টা বাংলাদেশে সহজ করা হলে, পরকীয়া কমে যেত ব্যাপকহারে।

যেকোনো মহিলা গায়রে মাহরাম পুরুষের সঙ্গে ওঠা-বসা, অবাধ মেলামেশা, বন্ধুত্ব গড়া বন্ধ না হলে, পরকীয়ার মতো জঘন্য অপরাধ বাড়তেই থাকবে। বিবাহ বিচ্ছেদের পাশাপাশি সংসারের শান্তি পেছনের দরজা দিয়ে পালাবে। ভেঙে যাবে আত্মীয়তা সম্পর্ক। পারবারিক কলহ দিনদিন মহামারি আকার ধারণ করবে। অতএব, দ্বিতীয় বিয়ে সহজ করা এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করা অপরিহার্য।

মাওলানা মহসিনের কথাগুলো ভালো লাগে না সাবিনার কাছে। স্বামীকে লক্ষ্য করে বলে– যতই বলেন, একজন স্ত্রী তার স্বামীর ভাগ অন্য কাউকে দিতে পারে না।

–তোমাদের এই ধারণা ভুল, বরং স্ত্রী যদি স্বামীকে ভালোবাসে, তাহলে স্বামীর প্রয়োজন বুঝে প্রথম স্ত্রীর পক্ষ থেকেই স্বামীকে আরেকটা বিয়ে করানো পুণ্যের কাজ। তোমার দেখার বিষয় হলো- আমি তোমার সঙ্গে কেমন আচরণ করি। আগের থেকে খারাপ নাকি ভালো। তোমার খোঁজখবর নিই কী না। আমার পক্ষ থেকে ভালোবাসার কমতি পেলে নিশ্চয়ই অভিযোগের সুযোগ আছে। একজন স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী থাকলে তাতে প্রথম স্ত্রীর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

সাবিনা রেগে গিয়ে বলে– তার মানে আপনি আরেকটা বিয়ে করবেন?

–না সে কথা বলছি না। প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই করব। তবে আমার প্রয়োজন নেই। আমার জন্য তুমিই যথেষ্ট। শোনো! দ্বিতীয় বিয়ে ফুর্তি কিংবা যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নয়। আল্লাহ তাআলা একেকজনকে একেকধরণের চাহিদা বা শক্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন। কোনো পুরুষ যদি দ্বিতীয় বিয়ে প্রয়োজন মনে করেন এবং দুই স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়নতা ঠিক রাখতে পারেন, তাহলে তার বিয়েতে সবার সম্মতি দেওয়া উচিৎ। দ্বিতীয় বিয়েকে যেমন ঘৃণা বা অন্যায় মনে করা যাবে না, ঠিক তেমনি শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদার জন্যও অধিক বিয়ে করা যাবে না। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ে যদি কেউ খারাপ দৃষ্টিতে দেখে, তাহলে সে শরীয়তকে অবজ্ঞা করে। একাধিক বিয়েকে অপরাধের দৃষ্টিতে দেখার কোনো সুযোগ নেই। একাধিক বিয়ে পরকীয়া রোধের মহৌষধ। অতএব, যোগ্য ব্যক্তিদের একাধিক বিয়ে করাটাই যুক্তিযুক্ত। তবে ইনসাফ বজায় রাখতে না পারলে, তার জন্য একাধিক বিয়ে করা ঠিক নয়।

আমেনা বেগম বলেন– যতই বলো বাবা! বর্তমান সময়ে একাধিক বিয়ে করলে সমান ভাগ থাকে না। একজনকে সময় কম দেয়, আরেকজনে বেশি।

মাওলানা মহসিন বলেন– আসলে সময় বা আসবাবপত্র সমান ভাগ করা শর্ত নয়, বরং যার যতটুকু প্রয়োজন, তাকে ততটুকু বুঝিয়ে দেওয়াই হলো ইনসাফ এবং সমান ভাগের মূল উদ্দেশ্য। যেমন প্রথম স্ত্রীর দুটি

সন্তান রয়েছে, সে ঘরে দুপুরের রান্নায় ১ কেজি চাউলের প্রয়োজন। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে কোনো সন্তান নেই, সেখানে দুপুরে ১ কেজি চাউলের প্রয়োজন নেই। যে ঘরে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু দেওয়াটাই হলো সমান ভাগ। এমন নয় যে, প্রথম স্ত্রীর ঘরে ১ কেজি চাউল দিলে দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরেও ১ কেজিই দিতে হবে। যার যার যৌক্তিক প্রয়োজন মেটানোই সমান ভাগের মূল ব্যাখ্যা বা উদ্দেশ্য।
তবে উপমহাদেশে একাধিক বিয়ে বেশ কঠিন! দ্বিতীয় বিয়ে করলে প্রথম স্ত্রী এটা নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে দেয়! অথচ দ্বিতীয় বিয়েতে প্রথম স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া স্পষ্ট গোনাহ।

এতক্ষণে ঘরের সবাই বুঝতে পারেন, মাওলানা মহসিনের উদ্দেশ্য খারাপ নয়। বরং একজন পুরুষের একাধিক বিয়ে বা দ্বিতীয় বিয়ে যে দোষণীয় নয়, সেটাও জানতে পারেন মাওলানা মহসিনের আলোচনায়। জমির উদ্দীন ভাবেন, দেশে দ্বিতীয় বিয়ের প্রচলন থাকলে, বড়ছেলেটার হয়ত এতটা অধঃপতন হতো না।

৯১
দু'দিন পর পরিচালক মাহিনকে ফোন দেন– তোমাদের জন্য একটা সাবলেট বাসা ঠিক করেছি। বাসাটা খালি আছে। তুমি যখন চাও ওঠতে পারো।
মাহিন জানতে চায়– সাবলেটের ভাড়া কত?
পরিচালক জানান– বাড়িওয়ালার ছেলেকে প্রতিদিন ১ ঘণ্টা প্রাইভেট পড়ালেই হবে।
–তাহলে তো ভালোই!
সঙ্গে সঙ্গে মাসনাকে ফোন দেয় মাহিন– বাসা ঠিক হয়েছে। এবার তোমাকে নিয়ে আসতে চাই। প্ল্যান করো কীভাবে কী করা যায়। –তুমি কাল চলে এসো। আমি ক্লাসে যাবার নাম করে স্কুল ব্যাগের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় নিয়ে নেবো। চৈতি আমার সঙ্গে থাকবে।

তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাবে।
–ঘর তো এখনও গোছানো হয়নি। জিনিসপত্র কিনতে হবে। আমার কাছেও টাকা নেই। ঘর গোছানোর জন্য কিছু আসবাবপত্র তো দরকার!
–ওসব নিয়ে টেনশন করো না। আমি কিছু টাকা নিয়ে আসব। তা দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নেবো।

বিবাহপূর্ব প্রেম কী জিনিস রে বাবা! একটা মেয়েকে মা-বাবার ঘর থেকে বের করে দেয়, অথচ সে খবর আদৌ মা-বাবা জানেন না! তারা মনে করেন, তাদের মেয়ে কত ভদ্র, শান্ত-শিষ্ট ও বাধ্যগত সন্তান! তাদের কথার বাইরে মেয়ে এক কদমও চলে না! অথচ সেই তারা জানেন না, কয়েক ঘণ্টা পরই তাদের মেয়ে অন্য ছেলের প্রেমের টানে, তাদের মুখে চুনকালি মেখে, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। এটাই প্রেমের পরিণতি। অবৈধ প্রেমে সম্মান নেই, আছে বেইজ্জতি, লাঞ্ছনা, অপদস্থ আর অপমান।
শুধু মেয়েকে দোষ দিলেও হবে না। দোষ মা-বাবারও আছে। একটি মেয়েকে যেভাবে আয়ত্বে রাখা দরকার, যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, তা মেয়ের মা-বাবা করেন না। বরং মেয়ের স্বাধীনতার ওপর সবকিছু ছেড়ে দেন! প্রত্যেক মা-বাবার দায়িত্ব নিজ সন্তানকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। খোঁজ-খবর রাখা; কোথায় যায়, কী করে, কার সঙ্গে মেশে। সময়টা ভালো নয়। এই যুগে ছেলে-মেয়েরা লাগামহীন থাকলে দুর্ঘটনা ঘটবেই। স্কুল-কলেজের নাম করে ছেলে-মেয়েরা পড়ার টেবিলের চেয়ে ঝোঁপ-ঝাড়ে সময় কাটাতেই বেশি পছন্দ করে।

৯২
সাবিনা কখনও ঢাকায় আসেনি। জীবনের প্রথম ঢাকায়। অবশ্য মাওলানা মহসিন আগেও কয়েকবার এসেছেন। তবে প্রিয়তমা স্ত্রীর সঙ্গে এই প্রথম। অনুভূতিটাই অন্যরকম।
সাবিনার পরিবারের ওপর দিয়ে যেই ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে, তাতে সবাই মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। শোকের আবহ এখনও কাটেনি। তাই

মাওলানা মহসিনের ইচ্ছা, সবাইকে নিয়ে একদিন চিড়িয়াখানায় ঘুরে আসবেন। তাতে হয়ত সবার মানসিক অবস্থা কিছুটা হলেও ফ্রেশ হবে। মাওলানা মহসিনের পরিকল্পনা শুনে সাবিনা অত্যন্ত খুশি হয়। রাতে খাবারের দস্তরখানে বিষয়টা উত্থাপন করে সাবিনা। মাহিনের বাবা জমির উদ্দীন প্রথমে রাজি না হলেও সবার অনুরোধে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

পরদিন চিড়িয়াখানার উদ্দেশ্যে বের হন পরিবারের সবাই। মনে অন্যরকম এক আবেগ কাজ করে সবার মাঝে।

আমেনা বেগম মাহিনকে লক্ষ্য করে বলেন– তুই আমাদের নিয়ে চল! সাবিনা ও জামাই ওদের মতো করে আলাদা ঘুরুক!

আমেনা বেগম চান, মেয়ে-জামাই একটু আলাদা সময় কাটাক। বিয়ের পর থেকে তো একান্তভাবে কোথাও বের হয়নি তাই। মায়ের প্রস্তাবটা বেশ জুতসই হয় সাবিনার জন্য।

মাওলানা মহসিন সাবিনাকে নিয়ে চিড়িয়াখানার দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন। নির্মল ও পবিত্র ভালোবাসায় দু'জন দু'জনার মাঝে খুঁজে পান অনন্য সুখ।

কিন্তু বেশিদূর যেতে পারেননি। চিড়িয়াখানায় এ কী বিশ্রী পরিবেশ! ভদ্র মানুষদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নেই সেখানে! ঝোঁপ-ঝাড়ে অশ্লীল ও আপত্তিকর অবস্থায় উঠতি বয়সী ছেলে-মেয়েদের ওঠা-বসা দেখে চিড়িয়াখানাটাকে একটা পশুর রাজত্বই মনে হয় না- রিতিমত পতিতালয় বলেই মনে হয় সাবিনার কাছে।

মাওলানা মহসিনকে জায়গাটা ত্যাগ করার অনুরোধ জানায় সাবিনা। মাওলানা মহসিন বলেন– বর্তমান সময়ে এসব দর্শনীয় স্থানগুলো ভদ্র মানুষের জন্য নয়। পরিবার নিয়ে আসা তো একেবারেই মুশকিল। চিড়িয়াখানাসহ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থানগুলো এখন যৌনাচারের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। বিবাহপূর্ব এই প্রেম-প্রেম খেলাটা যুবক-যুবতীদের শেষ করে দিচ্ছে।

প্রিয়তম স্বামীর মুখে এসব কথা শুনে মাহিন-মাসনার প্রেমের কথা স্মরণ হয়ে যায় সাবিনার। বিবাহপূর্ব প্রেমের শেষফল সম্পর্কে জানতে চায় সে। মাওলানা মহসিন বলেন; প্রেমের শেষফল খুবই করুণ ও বীভৎস। অশান্তি, যৌনতা এমনকি আত্মহত্যা ও খুন দিয়েও সমাপ্তি ঘটে এসব

সম্পর্কের। যা কখনও সুখকর নয়। আর যদি দুই-একটা সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়ও, তবে সে সংসারগুলো টেকে না। আবার টিকলেও অশান্তির রাজ্যে পরিণত হয় ঐ সংসার।

সাবিনা পেরেশান হয়ে ওঠে মাওলানা মহসিনের কথা শুনে। মাহিনকে মাসনা থেকে ফেরাতেই হবে। সাবিনা আবার জানতে চায়, এক-দুইটা সংসারও কি সুখের হয় না?

যদিও হয় তবে বিরল। শোনো! গভীর প্রেমের সম্পর্ক অতপর বিয়ে। বাসায় গিয়ে এমন একটা সংসারের ঘটনা শুনাব তোমাকে। এই বলে চিড়িয়াখানা ত্যাগ করেন মাওলানা মহসিন।

৯৩

আমেনা বেগম বেশ উপভোগ করেন চিড়িয়াখানার দৃশ্যাবলী। হরেক রকমের প্রাণী ও ফল-ফুলে প্রমোদিত হন তিনি। আগে কখনও সামনে থেকে এভাবে দেখেননি। ফলে আনন্দটা একটু বেশিই ছিল। কিন্তু জায়গায় জায়গায় ছেলে-মেয়েদের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি দেখে বিব্রতবোধ করেন আমেনা বেগম। জমির উদ্দীন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আফসোস করে বলেন– এই বয়সে এসে এসব দেখতে হবে ভাবিনি। এসব মেয়েরা নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণেই আজকের এই অধঃপতন। আমাদের রাশেদের জীবনেও ঠিক একই কারণে অধঃপতন নেমে আসে। ও আমাদের কথা শোনেনি। সবসময় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেছে। আমাদের আদর্শে গড়ে ওঠেনি। এলাকার দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে বাজেআড্ডায় সময় কাটিয়েছে।

মাহিনকে উপদেশ দিয়ে আমেনা বেগম বলেন– খবরদার! তুই সাবধান হয়ে চলবি বাবা! এসবের দিকে একদম এগোবি না।

জমির উদ্দীন বলেন– আমাদের মাহিন এমন হতেই পারে না। মাহিকে নিয়ে আমার গর্ব হয়। ছেলে হলে মাহিনের মতোই হতে হয়।

মাহিন নতুন করে চিন্তায় পড়ে যায়। বাবা-মায়ের আস্থা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা একদিকে, অন্যদিকে মাসনার প্রেম। কী করবে ভেবে পায় না। তবে মাসনাকে ছেড়ে আসা সম্ভব নয়! মাসনার প্রেম গ্রাস করে নেয়

তাকে। মা-বাবাকে বুঝিয়ে একদিন মানিয়ে নেবে; এমনটা ভেবে মনকে সান্ত্বনা দেয় মাহিন।

বর্তমান সময়ের উঠতি বয়সী ছেলে-মেয়েরা প্রেমাসক্তিতে এভাবেই মা-বাবার আস্থা ও বিশ্বাস ধুলিস্যাৎ করে দেয়। স্বপ্ন ভেঙে খান খান করে তাদের। তারা মনে করে, আমরা যা বুঝি আমাদের মা-বাবারা তা বোঝেন না।
তারা এও মনে করে- প্রেমের সম্পর্কে অশান্তির কোনো লেশমাত্র নেই। বিয়ের আগে সুন্দর বোঝাপড়া, দু'জন দু'জনকে মেনে নেওয়া, দোষ-ত্রুটিগুলো স্বাভাবিক দৃষ্টিকে দেখা, তাতে প্রেমিকযুগলের সাংসারিক জীবন এর থেকেও বেশি সুখী হওয়ার কথা। প্রেমিক-প্রেমিকারা এমনটাই ভেবে থাকে। যদিও সমাজে এমন নজির নেই বললেই চলে। চোখের সামনে সবকিছু ঘটার পরও তারা শিক্ষা গ্রহণ করে না। কারণ, প্রেমউন্মাদনা মানুষকে অন্ধ বধির ও জ্ঞান শূন্য করে দেয়।

৯৪
পরিবেশ অনুকূলে না থাকায় দ্রুত বাসায় ফেরেন মহিনদেও পরিবার। দিন শেষে রাতের বিছানায় গল্পটা শোনার জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করে সাবিনা। ইতোমধ্যে মাওলানা মহসিন সাবিনার ঘরে ঢোকেন।
–গল্পটা শুনতে চাই; বলে সাবিনা।
–না না, আমি ক্লান্ত। ডিস্টার্ব করবে না আমায়। আমি এখন ঘুমুব; সাবিনাকে ক্ষেপানোর জন্যই মূলত কথাগুলো বলেন মাওলানা মহসিন। সাবিনা অভিমান করে অন্যদিক ফিরে বসে থাকে। বলে– ঠিক আছে বলতে হবে না। আপনি মাওলানা মানুষ। আপনার ওপর কথা বলার সাহস আছে আমার!
মাওলানা মহসিন বুঝতে পারেন সাবিনা রাগ করেছে। তাই পেছন থেকে গিয়ে সাবিনার কপালে চুমু খেয়ে বলেন– এত রাগ করলে হয় নাকি? আমি তো দুষ্টুমি করেছি! আচ্ছা তাহলে শোনো! এই বলে বলতে শুরু করেন মাওলানা মহসিন।

৯৫

বাসায় ফিরে ফ্রেশ হয়ে বাইরে বেরোয় মাহিন। মাসনার সঙ্গে কথা হয় না একদিন। কথা বলার জন্য মনটা আনচান করে মাহিনের। ফোন দেয় মাসনাকে।

–তোমার ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম। কখন নিয়ে যাবে আমাকে? আমার আর ভালো লাগে না; বলে মাসনা।

কথা বলতে বলতে কল্পনার জগতে হারিয়ে যায় দু'জন।

'অভিভাবকদের উচিৎ, বিয়ের আগে ছেলে-মেয়ের হাতে মোবাইল না দেওয়া। ছেলে-মেয়েদের জীবন নষ্ট করার পেছনে মোবাইল অন্যতম কারণ। অভিভাবকদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি। নিজ সন্তানকে ছোট থেকে নিয়ন্ত্রণ না করলে, পরে পস্তাতে হয় নিশ্চিত। মোবাইল ও অনলাইন আসক্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই অনেক ছেলে-মেয়ে নষ্ট হয়ে যায়। লজ্জা-শরম কমে যায়। সততা-সভ্যতা হারিয়ে ফেলে। পশ্চিমা সংস্কৃতি গ্রাস করে নিচ্ছে এই সময়ের তরুণ ও যুব সমাজকে। আগের মতো এখন চিঠির রীতি নেই। মোবাইল মেসেজে চিঠির আদান-প্রদান হয়। অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও এসব অনৈতিক সম্পর্ক ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে অভিভাকদের সচেতন হওয়া উচিৎ। উচিৎ মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারে সন্তানকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা'।

৯৬

আমার শিক্ষাজীবনে আমাদের মাদরাসার পাশে ধনবান লোকের একছেলে পার্শ্ববর্তী একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। গভীর প্রেম। লেখাপড়া বাদ দিয়ে নিয়মিত মেয়েটাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ছেলেটা। সম্পর্কের বিষয়টা জানাজানি হলে পারিবারিকভাবে কোনো পরিবারই তাদের সম্পর্ক মেনে নেয় না। সম্পর্কের খবর জেনে মেয়ের বাবা দ্রুত মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

কিন্তু মেয়ে ঐ ছেলে ব্যতিত অন্য কোনো ছেলেকে বিয়ে করবে না। মেয়ের গতিবিধি সন্দেহ হওয়ায় মেয়েকে ঘরবন্দি করে রাখেন বাবা। মনে মনে ভাবেন- ইসলামী বিধান মতে যদি শুরু থেকেই মেয়েকে নিয়ন্ত্রণে রাখতাম এবং পর্দা করাতাম, তাহলে আজ এই অপমান আর পরিস্থিতির শিকার হতাম না।

ক'দিন পর মেয়ের বাবা মেয়ের বিয়ে ঠিক করেন। বিয়ের খবর শুনে প্রেমিক ছেলেটা আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামের এক কৃষকের চেষ্টায় বেঁচে যায় সে। পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পরে লাইলী-মজনুর প্রেমকাহিনী।

এলাকার লোকজন মেয়ের বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন– ওদের মাঝে যে গভীর সম্পর্ক, তা কোনোদিন ভেঙ্গে যাবার নয়। ওরা সাংসারিক জীবনে খুবই সুখী হবে।

মেয়ের বাবা কোনো মতেই রাজি হন না। মেয়ের বাবা ফাইনালী মেয়ের বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করেন এবং নির্দিষ্ট তারিখে বিয়ের আয়োজনও করেন। ধুমধামে চলে বিয়ের আয়োজন। কিন্তু বিয়ের আসর থেকে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যায় মেয়েটা। এতটুকু বলে মাওলানা মহসিন একটু থামেন।

–তারপর কী হলো!

বড় কৌতুহল নিয়ে জানতে চায় সাবিনা। মাওলানা মহসিন আবার বলতে শুরু করেন– পালিয়ে গিয়ে একমাস পর্যন্ত বিভিন্ন হোটেলে সময় কাটায় তারা। বিয়ে ছাড়াই দৈহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাদের মাঝে।

মূলত এসব প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক দেহভোগের লালসায়ই হয়ে থাকে। বিয়ের আগে দেহভোগের লালসা পূর্ণ হয়ে গেলে, বিয়ের প্রয়োজনীয়তা মনে করে না। আর বিয়ের আগে লালসা পূর্ণ না হলে, কোনো কোনো সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু বিয়ের পর দেহভোগ হয়ে গেলে সংসারটা বেশিদিন টেকে না। কেননা, উদ্দেশ্য ছিল দেহভোগ। যদি দু'একটা সংসার টিকেও যায় তাহলে সে সংসারগুলো হয় দুনিয়ার জাহান্নামসাদৃশ।

যা হোক, একমাস পর তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব হয়। দ্বন্দ্বের শুরু বিয়ে নিয়ে। মেয়েটা ছেলেটাকে বিয়ের জন্য চাপ দেয়। কিন্তু ছেলে গড়িমসি শুরু করে। ছেলেটার উদ্দেশ্যই ছিল লালসা। লালসা শেষ, এখন বিয়ে

করবে কেন?

মেয়ে মামলার হুমকি দেয়। বাধ্য হয়ে কাজী অফিসে গিয়ে বিয়ে করে তারা। নতুন সংসার বাঁধে। কিন্তু সংসারে আনন্দময় যে রং, সে রং ফিকে হয়ে যায় বিয়ের প্রথমদিকেই। যে সংসার শুরু হওয়ার কথা মধুর স্মৃতি নিয়ে, সে সংসার শুরু হয় তিক্ততা আর দুঃস্বপ্ন নিয়ে। যারা বিয়ের আগে একমাস হোটেলে কাটায়, তাদের সংসার, বাসররাত, মধুর স্মৃতি বলে কিছু থাকে না।

বিয়ের বছরখানিক পর তাদের মা-বাবা সম্পর্কটা মেনে নেন। এলাকার মানুষ তাদের দু'জনের প্রেমকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেন। সুখী দম্পতি বলেই সবাই জানেন তাদের। এভাবে চারবছর কেটে যায় তাদের সংসার জীবন।

একদিনের ঘটনা- আমরা ক্লাসে বসে আছি। হঠাৎ হট্টগোলের শব্দ শোনতে পাই। জানতে পারি ঐ ছেলেটা আত্মহত্যা করেছে! যে শোনে সেই অবাক হয়। কোন দুঃখে আত্মহত্যা করবে? সুখের সংসার। ফুটফুটে একটা ছেলে। সবার সঙ্গে হাসিখুশি চলত, সেই ছেলে আত্মহত্যা করবে কেন?

৯৭

ঘটনাস্থলে পুলিশ হাজির। তারা ছেলেটার শরীর তল্লাশি করে কয়েক পৃষ্ঠার একটা চিঠি পান। উৎসুক এলাকাবাসী জানতে চান চিঠিতে কী লেখা আছে। একজন পুলিশসদস্য চিঠিটা পড়ে শোনান সবাইকে। চিঠির ভাষা শুনে সবাই যেন আসমান থেকে পড়েন! এ কীভাবে সম্ভব! কারও কল্পনায়ও ছিল না- এই জুটির বেলায় এমনটা ঘটতে পারে।

কী লেখা ছিল চিঠিতে? জানতে চায় সাবিনা। মাওলানা মহসিন আবার বলতে শুরু করেন– চিঠিতে লেখা ছিল; 'আমরা স্কুল জীবনে একে অপরকে পছন্দ করি এবং সেখান থেকেই ভালোবাসার সম্পর্ক শুরু। পারিবারিক অমত থাকা সত্বেও কাজী অফিসে বিয়ে হয় আমাদের। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই শুরু হয় অশান্তি আর যন্ত্রণা। প্রতিদিন কিছু না কিছু নিয়ে ঝামেলা হতোই। এভাবেই ঝগড়া লেগে থাকে আমাদের

সংসারে। সবসময় আমাকে টেনশনে রাখত আমার স্ত্রী।
যে বিষয়গুলো আমার অপছন্দ ছিল, তা সব ছিল ওর মাঝে। আমাকে অভিযোগ করা ছিল ওর নিত্যদিনের রুটিন। তর্ক হলে এমনভাবে কথা বলত, মনে হয় আমাকে চেনেই না! শত্রু থেকেও বেশি দুর্ব্যবহার করত আমার সঙ্গে। শিক্ষিত মেয়ে হয়ে ওর আচরণ এমন হতে পারে, তা কল্পনায়ও ছিল না।

স্বস্তি নিয়ে চলতে পারিনি সাংসারিক জীবনে। ইচ্ছে করে কষ্ট দিয়ে কথা বলত আমায়। বাসার পাশের লোকজন সবাই মনে করত আমি খুব খারাপ। তারা ভাবত- আমি ওর ওপর নির্যাতন চালাতাম! তর্ক হলে যার-তার কাছে আমার বিরুদ্ধে কথা বলত। সবাইকে বলত, আমার মতো খারাপ ছেলে-স্বামী হয় না। ও নিজ থেকেই সন্দেহ করে আমাকে অভিযোগ করে কথা বলত। একসময় সেই সন্দেহযুক্ত অভিযোগগুলোই বাস্তব হিসেবে দাঁড় করাতো!

বিয়ের আগে প্রেমের জীবনের বোঝাপড়াটা বিয়ের পর মোটেই ছিল না। রাজ্যের অশান্তি মাথায় নিয়ে দিন কাটাই আমি।

বিয়ের একবছর পর মান-অভিমান ভুলে আমাদের সম্পর্ক মেনে নেন মা-বাবা। কিন্তু সাংসারিক অশান্তি কমেনি তাতে। বরং দিনদিন বেড়েই চলে। বন্ধু-বান্ধব আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে; বাচ্চা-কাচ্চা হলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

পারিবারিক সমঝোতা হলেও আমার মা-বাবাকে একদম সহ্য করতে পারে না আমার স্ত্রী। এটা মেনে নেওয়া আমার জন্য আরও কষ্টের ছিল। যতবার মা-বাবা আমার বাসায় যেতেন, কষ্ট না পেয়ে ফিরতে পারতেন না। তাদের সঙ্গে কথা বলত না, ভালো আপ্যায়ন করত না, তাদের সামনে মুখ গোমড়া করে থাকত সবসময়। আবার মা-বাবাও কথায় কথায় ওর দোষ খুঁজতেন। আমি জিন্দা লাশ হয়ে বেঁচে ছিলাম এতদিন। আমি কী চাই তা কেউ বুঝত না। না আমার স্ত্রী, না আমার মা-বাবা। ভেবেছিলাম একটা বাচ্চা হলে হয়ত সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

বিয়ের দেড়বছর পর একটি ছেলে হয় আমাদের। কিন্তু বাচ্চা হওয়ার পর আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে আমার স্ত্রী। আমাকে স্পষ্ট জানিয়ে

দেয়, এখন সবার আগে ছেলে। তোমার মা-বাবা যেন আমাকে বিরক্ত না করে। আমি তোমার মা-বাবার চাকরানী হতে পারব না।

নীরবে চোখের পানি ঝরানো ছাড়া কিছুই করার ছিল না আমার। অথচ আমার শ্বশুর-শাশুড়ী দিনের পর দিন পরে থাকতেন আমার বাসায়। বাচ্চা গর্ভে থাকাকালীন সময়ও এমন কোনো মানসিক কষ্ট দেওয়া বাকি রাখেনি যা ওর মনে ছিল। ব্লাকমেল ও মানসিক প্রেশারেই রাখত আমায়। ওর এত অহঙ্কার ছিল, যা কল্পনাও করিনি। আমার মা-বাবার সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করতে দুইবার ভাবেনি কখনও। তারা ওকে চরম একটা বেয়াদব মেয়ে হিসেবেই চিনতেন। আমার চাওয়া-পাওয়ার কোনো মূল্য ছিল না ওর কাছে। আমাকে ও আমার মা-বাবাকে অপমান ও হেয় করে কথা না বললে ওর পেটের ভাত হজম হতো না।

সবসময় খোটা দিয়ে কথা বলত আমার সঙ্গে। খোটা দেওয়ার মতো এমন কোনো বিষয় বাকি ছিল না- যার খোটা ও দেয়নি। ওর ওপর কোনোদিন খুশি থাকতে পারিনি। সারাক্ষণ মনটা খারাপ থাকত আমার।

এভাবেই চারবছর কেটে যায় আমাদের সংসার জীবন। আমার কলিজার টুকরা ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু সুখ খোঁজার চেষ্টা করি। ছেলেটা আমার মা-বাবাকে চেনে না। কিন্তু নানা-নানীকে খুব ভালোভাবেই চেনে। আমার মা-বাবা ছেলেকে ডাকলে কাছে যায় না। এটা যে আমার জন্য কতবড় যন্ত্রণার তা কাউকে বোঝাতে পারিনি। অপরদিকে আমার মা-বাবাও ঐরকমভাবে ছেলেটাকে কাছে টানেননি। স্ত্রী ও মা-বাবা সবার অভিযুক্ত ব্যক্তি আমি। গভীর রাতে কাঁদতাম; মা-বাবা বা স্ত্রী কেউই আমাকে বুঝত না। আমি কী চাই, তার কোনো মূল্য ছিল না তাদের কাছে। তারা শুধু তাদেরটাই বুঝত।

বিয়ের আগে যে মেয়েটা আমাকে ছাড়া কিছুই বুঝত না, আমার ভালো-মন্দ খেয়াল রাখত, বিয়ের পর সেই মেয়েটা আমাকে বুঝতেই চায় না। পরিশ্রম করে বাসায় ফিরলে ভালো আচরণ পেতাম না। কখনও কখনও কথার তীর এমনভাবে বিদ্ধ হতো- রাতেও ঘর থেকে বেরিয়ে যেতাম মাঝে মাঝে। কথার মাঝে কোনো রস ছিল না। ছিল না ভালোবাসা। আমি ভাবিনি প্রেমের বিয়ে এতটা অশান্তির হয়।

গতকাল ঘুমুচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার স্ত্রীর মোবাইলে মেসেজটোন শুনে সজাগ হই। মোবাইলটা আমার বালিশের নিচেই ছিল। মোবাইল হাতে নিয়ে দেখি অপরিচিত একব্যক্তির মেসেজ! 'হায় জানু' বলে সম্বোধন করেছে লোকটা। প্রথম ভেবেছি কোনো বখাটে কাজটা করেছে। কারণ হাজার অমিলের মাঝেও ওকে বিশ্বাস করতাম খুব। কিন্তু মোবাইল মেসেজের পুরান হিস্টোরি দেখে আমার চোখ ছানাবড়া!

ফেসবুক মেসেঞ্জারে ভিনপুরুষের সঙ্গে আপত্তিকর দৃশ্য! হার্টবিট বেড়ে যায় আমার। মনে হয় ঘুমন্তাবস্থায়ই ওকে মেরে ফেলি। কোনোমতে রাতটা পার করি। আজ সকালে এসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে ও। কী ব্যবহার! কথা থেকে যেন বিষ ঝরে! এত অভদ্র ও অসভ্য পৃথিবীতে দেখিনি। আমার সঙ্গে রাগ করে ছেলেটাকে মারত।

শেষ পর্যন্ত জানতে পারি, ঐ লোকের সঙ্গে সুযোগ পেলেই মেলামেশা করত আমার স্ত্রী! তাই ব্যর্থ এ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার প্রয়োজীয়তা হারিয়ে ফেলি। আজ যখন এই চিঠিটা আপনারা পড়বেন, তখন আমি ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। তবে ওকে ক্ষমা করে যেতে পারলাম না। আমার ছেলেটাকে দেখে রাখবেন সবাই।'

সাবিনা মাহিনকে শক্ত করে ধরে রাখে। একটা জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বীভৎস কাহিনী শুনে অস্বস্তিবোধ করে। বলে– আমি আপনার সঙ্গে কোনদিনও এমনটা করব না। আপনি যেভাবে চাবেন, সেভাবেই চলব।

–সে আত্মবিশ্বাস আমার আছে। আমি জানি আমাদের সংসার জীবন অতি সুখের হবে ইনশাআল্লাহ। কেননা, আমাদের সম্পর্ক কোনো ঠুনকো সম্পর্ক নয়। পবিত্র বন্ধনে গড়ে ওঠা সম্পর্ক কখনও পরাজিত হয় না। আমাদের ভালোবাসা কমবে না, বরং বাড়তেই থাকবে।

মাওলানা মহসিনের কথায় স্বস্তি পায় সাবিনা। সাবিনা আরও জানতে চায়– ছেলেটা কি কোনো দোষ করেনি?

মাওলানা মহসিন বলেন– কী বলো! দোষ তো উভয়েরই সমান। পরে জানতে পারি, ছেলেটাও নাকি স্ত্রীকে অবহেলা করত। অন্য মেয়েদের

সঙ্গে সময় কাটাত। দু'জনের কারও চরিত্রই প্রশ্নমুক্ত নয়। মোটকথা এসব সম্পর্ক বিয়ের আগে যত মধুরই হোক না কেন, শেষ পরিণতি চরম খারাপ।

৯৮

কোচিং পরিচালকের সঙ্গে দেখা করে বাসার ঠিকানা নিয়ে বাসাটা দেখে আসে মাহিন। বেশ গোছানো একটি বাসা। রুমগুলো পরিষ্কারই আছে। নতুন করে কিছুই করতে হবে না। শুধু প্রয়োজনীয় কিছু মালামাল কিনতে হবে। মাহিন পরিচালক থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়ে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে বাসায় রেখে দেয়।

দুপুরের খাবার দস্তরখানে বাবা জমির উদ্দীনকে বলে– আজ সন্ধ্যায় আমাকে একটু কলেজে যেতে হবে। মানে নিজ এলাকায়। কোচিং সেন্টারের জন্য কিছু কাগজপত্র দরকার। যা কলেজ থেকে আনতে হবে। আবার কালই চলে আসব। জমির উদ্দীন সরলমনে মাহিনকে যাওয়ার অনুমতি দেন। আমেনা বেগমও মাহিনের মাথায় হাত রেখে দোয়া করেন।

প্রেম তথা অন্যায় করলে এভাবেই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় বারবার। কখনও ভাই, কখনও বাবা, কখনও মা, কখনও সমাজ, কখনও শিক্ষক কিংবা বন্ধু-বান্ধব, সবার কাছে মিথ্যা বলতে হয়।

৯৯

এাহিন-মাসনার সম্পর্কের কথা ভেবে হয়রান সাবিনা। ওদেরকে ফেরাতেই হবে। নাহয় বড়ধরণের ক্ষতির মুখে পড়ার শঙ্কা আছে।

মাওলানা মহসিন লক্ষ্য করেন, সাবিনা কোনোকিছু নিয়ে গভীর ভাবনায় পড়েছে।

–কী ভাবছো?

মাওলানা মহসিনের কথায় সম্বিত ফিরে পায় সাবিনা।
–না কিছু না। এমনিতেই মনটা ভালো লাগছে না।
–আমার কাছেও বলা যায় না!
এই বলে মাওলানা মহসিন খাট থেকে উঠে পাঞ্জাবীটা হাতে নেন। সাবিনা ভয় পেয়ে যায়। দৌড়ে গিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে। –কোথায় যান আপনি? আমার সঙ্গে রাগ করেননি তো?
মাওলানা মহসিন সাবিনাকে চমকে দিয়ে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে কয়েকটা চকলেট বের করেন। –তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? আর আমি রাগইবা করব কেন? তোমার মতো সহজ-সরল মেয়ের সঙ্গে রাগ করা যায়? আমি তো চকলেক বের করতে পাঞ্জাবী হাতে নিয়েছি! এই বলে হেসে ফেলেন মাওলানা মহসিন। প্রিয়তমার হাতে একটি চকলেট দিয়ে বলেন– তোমার জন্য তেমন কিছু তো আনতে পারিনি। তবে ভালোবেসে চকলেট নিয়ে এসেছি। এই চকলেটের সঙ্গে পৃথিবীজোড়া ভালোবাসা মিশ্রিত আছে।
সাবিনা মাওলানা মহসিনের পাগলামো বেশ উপভোগ করে। চকলেটটি মুখে পুরে সাবিনার কাছে মনে হয়, সত্যিই পৃথিবীর সব থেকে দামী ও মজাদার চকলেটটিই খায় সে। মুখ থেকেই অর্ধেকটা স্বামীর মুখে পুরে দেয় সে। মাওলানা মহসিন বলেন– নবীজি সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিবিদের মুখের খাবার খেয়েছেন।

১০০

বিকেলে বাস কাউন্টারে উপস্থিত হয় মাহিন। রাতের গাড়ির টিকিট কেটে গাড়িতে উঠে। কাকতালীয়ভাবে দেখা হয়ে যায় সেই লোকটির সঙ্গে– যে লোকটির বোন নিয়ে বড়ভাই রাশেদ নিরুদ্দেশ হয়েছে। দু'জন দু'জনকে দেখে বিব্রতবোধ করে। লোকটার চেহারা কালো হয়ে গেছে। চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। মুখটা শুকিয়ে গেছে। দেখেই বোঝা যায় দুপুরে কিছু খাননি।
এখনও গাড়ি ছাড়তে কিছু সময় বাকি। মাহিন বলে– চলেন ভাই কিছু খেয়ে আসি।

লোকটি ডান দিকে মাথা কাত করে সম্মতি জানান। বাসস্ট্যান্ডের একটি চা-দোকানে গিয়ে বসে তারা। মাহিন চা-রুটির অর্ডার করে। একমগ পানি নিয়ে মুখ ধুয়ে নেন লোকটি।

ফ্রেশ হয়ে চা দিয়ে রুটি ভিজিয়ে খান। বেশ সময় নিয়েই খান আর একধ্যানে কী যেন ভাবেন।

–ভাই আপনি ঢাকায় কী কারণে? আর আপনার চেহারার অবস্থাই বা এমন কেন? জানতে চায় মাহিন।

–আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। জানতে পারি আপনারা কেউ বাড়িতে নেই। কোথায় গিয়েছেন সে খবরও দিতে পারেনি কেউ। ভাসা ভাসা খবর পাই আপনার ভাই রাশেদ ঢাকাতেই কোথাও আছে।

–যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, আমাদের ইজ্জতের কথা ভাবেনি, সম্মানের কথা ভাবেনি, সংসারের কথা ভাবেনি, তাদের খোঁজার কী দরকার!

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লোকটি বলেন– এমনি এমনি তো আর খুঁজছি না ভাই! আমার ছোট ছোট তিনটি ভাগ্নি আছে। ওদের গগনবিদারী চিৎকারে এলাকার লোকজন জড়ো হয়ে যায়। ওরা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমোয় এবং কাঁদতে কাঁদতেই ঘুম থেকে জাগে। ঠিকভাবে খাওয়া-দাওয়া করে না। রাস্তায় গিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে মা মা বলে কাঁদে। মাঝে মাঝে ছয়বছরের বড় ভাগ্নি আঙুলের ইশারায় পথ নির্দেশ করে ছোট দুইবোনকে বলে, 'এদিক থেকে মা আসবেন'। ছোটভাগ্নি দুইটা বড়ভাগ্নিকে জড়িয়ে ধরে জানতে চায়, 'সত্যিই কি মা আসবেন'? 'হ্যাঁ আসবে। মা কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন'।

আমরা কেউ বাইরে থেকে বাড়ি ফিরলেই দৌড়ে এসে জাপটে ধরে জানতে চায়, ওদের মাকে খুঁজে পেয়েছি কী না। সন্ধানী চোখগুলো শুধু মাকেই খুঁজে বেড়ায় ওদের। যাকে সামনে পায় তার কাছেই মা'র কথা জানতে চায়। একবছর হয়ে যায় ওদের মা নিরুদ্দেশ। কিন্তু ওরা এখনও মাকে ভুলতে পারেনি। বড় হয়ে যখন জানবে ওদের মা পরকীয়া করে ওদের ফেলে চলে গেছে, তখন ওরা কেমন করবে?

বলতে বলতেই হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলেন লোকটি।

স্টেশনের চা-দোকানী সব শুনে বলেন– জনাব পরকীয়া কেস! স্টার জলসা, জি-বাংলার কবলে পুরো বাংলাদেশ। এখন ইবাদাত

(নাউযুবিল্লাহ) মনে করে পরকীয়া করে গৃহবধু ও গৃহকর্তারা। একটা ঘর ভেঙ্গে, স্বামী-সন্তান ফেলে, একজন মহিলা কী করে অন্যের হাত ধরে চলে যায়? যে মহিলা এমনটা করতে পারে, তার কি কোনো চরিত্র আছে? যে পুরুষটা এমন করে, সেইবা কেমন পুরুষ? এদের আর পশুর মাঝে ব্যবধান নেই। পরকীয়া করা নারী-পুরুষের লজ্জাও একটু কম। চা-দোকানীর কথায় দু'জনই লজ্জা পায়। কারণ তারা দু'জন যে পরকীয়া যুগলের আপন ভাই।

১০১

মাওলানা মহসিনের ভালোবাসায় আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলে সাবিনা।

–কী ব্যাপার কাঁদছো কেন?

প্রশ্ন করেন মাওলানা মহসিন।

–আবেগ ও খুশিতে। আপনার মতো একজন স্বামী পেয়ে আমার জীবন ধন্য। এত ভালোবাসা আমার কপালে লেখা ছিল কল্পনাও করিনি।

–স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। তুমি দোয়া করো, আমাদের মাঝে এ ভালোবাসা যেন জান্নাত অবধি টিকে থাকে।

–দিনদিন আপনার প্রতি ভালোবাসাটা বেড়েই চলছে। আপনাকে ছেড়ে একা থাকতে বড্ড কষ্ট হবে এবার। প্রতিবারই কষ্ট হয়। কিন্তু মনে হচ্ছে এবার একটু বেশি হবে। আমার আর একা থাকতে ভালো লাগে না। ঢাকায় কোনো মাদরাসায় খেদমত নেওয়া যায় না? সাবিনার আবেগজড়িত প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা মহসিন বলেন– আমারও ইচ্ছা ঢাকায় স্থায়ী হওয়া। তোমাকে ছেড়ে আমারও থাকতে কষ্ট হয়। কাল বের হব ইনশাআল্লাহ। আমার এক ক্লাসমেট আছেন, যিনি ঢাকাতেই বড়এক মসজিদের খতীব এবং পাশের একটি মাদারাসায় খেদমত করেন।

১০২

গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। চা-দোকানের বিল পরিশোধ করে গাড়িতে ওঠে মাহিন। নির্দিষ্ট সময় গাড়ি ছেড়ে দেয়। গাড়ি ছাড়ার পর থেকে দু'জনই অনেক্ষণ ধরে যার যার মতো চুপচাপ বসে থাকে। নীরবতা ভেঙ্গে লোকটি মাহিনের কাছে বাড়ি ছাড়ার কারণ জানতে চান। মাহিন বলে– ভাবীর মামলায় বাবা দুইমাস জেল খেটেছেন। বড়ভাই ভাবীকে তালাক দিয়েছেন। এর থেকে বেশি কিছু বলার নেই। লোকটি বুঝতে পারেন, মাহিনদের ওপর দিয়ে কতবড় ঝড় গিয়েছে।

–আচ্ছা আপনার ভাইর কোনো সন্ধান পেয়েছেন?

আবারও জানতে চান তিনি।

–না, আমরা জানি না। জানার চেষ্টাও করি না। তার মতো ভাই আমাদের প্রয়োজন নেই।

মধ্যরাতে একটি হাইওয়ে হোটেলে গাড়ি থামে। যাত্রা বিরতিতে রাতের খাবার খেয়ে নেয় তারা। খাবার মাঝেই মাসনার ফোন! ফোন রিসিভ করার আগেই লোকটি জানতে চান– কে ফোন করেছে এত রাতে?

প্রশ্নটা এড়িয়ে যায় মাহিন। ফোন রিসিভ করতেই মাসনা জিজ্ঞেস করে– কতদূর তুমি? আর কতক্ষণ লাগবে? তোমার অপেক্ষায় ঘুম হচ্ছে না।

মাহিন বলে– আশা করি সকাল সকাল চলে আসব। তুমি সবকিছু নিয়ে প্রস্তুত থেকো।

এই বলে ফোন রেখে দেয় মাহিন।

১০৩

পরদিন সকালের নাস্তা শেষে ক্লাসমেটের সঙ্গে দেখা করার জন্য বের হন মাওলানা মহসিন। একদিকে ঢাকার যানজট, অন্যদিকে ঠিকানা বিভ্রাট, পৌঁছুতে পৌঁছুতে দুপুর হয়ে যায় তার। গিয়ে দেখেন যোহর নামাযের জামাত চলে। অজু করে নামাযের জামাতে শরিক হন মাওলানা মহসিনও।

নামায শেষে মাওলানা মহসিনকে দেখে অবাক হন তার ক্লাসমেট–

আরে মহসিন ভাই আপনি? কীভাবে? কোত্থেকে?
বহুদিন পর বন্ধুর দেখা পেয়ে একশ্বাসে প্রশ্নগুলো করেন তিনি। মাওলানা মহসিন বলেন– আপনার ঠিকানা বের করতে করতে বেশ সময় লেগে যায়। আমি আরও ক'দিন আগেই ঢাকায় এসেছি। আমার শ্বশুর পরিবার ঢাকা আসার সুবাদে মাদরাসা থেকে এক সপ্তাহ'র ছুটি নিয়ে আমিও ঢাকায় আসি।
–সে কী! আপনি বিয়ে করেছেন?
জানতে চান মাওলানা মহসিনের ক্লাসমেট। মাওলানা মহসিন বলেন– ফোন নাম্বার না থাকায় আপনাকে জানাতে পারিনি। তবে বিয়ের সময়টাতে আপনাকে খুব মিস করেছি।
–অসুবিধা নেই। আপনার বিয়ে হয়েছে শুনে খুব খুশি হয়েছি। তো ভাবী সাহেবা কেমন আছেন? দেখতে কেমন? আপনার পছন্দ মতো হয়েছে তো! আচার-ব্যবহার কেমন?
মাওলানা মহসিন বলেন– এককথায় অসাধারণ। এমন একটি নম্র-ভদ্র ও দীনদার মেয়ে পাব কল্পনাও করিনি।

১০৪

খুব ভোরেই গন্তব্যে পৌঁছে মাহিন। লোকজন তখনও ঘরের বাইরে বের হয়নি। সেই ফাঁকে নিজেদের বাড়ি চলে যায় সে। চারদিকটা ঘুরে দেখে। যেই বাড়িটা মা-বাবা আর ভাই-বোনের পায়চারিতে সজীব ছিল, সেই বাড়িটা নীরব নিথর হয়ে পড়ে আছে। জীবনের সব স্মৃতি ঐ ছোট্ট বাড়িটি ঘিরেই ছিল মাহিনের।
লোকজন দেখে ফেললে নানা প্রশ্ন করবে। জানতে চাইবে বাড়ি ছেড়েছে কেন? রাশেদ কোথায় আছে? অনেকে আবার খোঁচা দিতেও ভুলবে না। সেসবের জবাব দিতে নিজের কাছেই খারাপ লাগবে তার। তাই লোকচোখের আড়ালে নীরব একটা জায়গায় গিয়ে সময়ের অপেক্ষা করে মাহিন। সকাল ৯টায় মাসনার ফোন– আমরা প্রস্তুত।
দেরি না করে দ্রুত চলে যায় মাহিন। বহুদিন পর দেখা। অন্যরকম এক ভালো লাগা কাজ করে দু'জনের মাঝে। সঙ্গে চৈতি থাকায় একে

অপরকে কাছে টেনে নিতে পারে না। নাহয় দু'জনই খুব করে চায় একে অপরকে জড়িয়ে ধরতে। একজনের কাছে আরেকজনকে খুব আপন মনে হয়। মনে হয় কোনোদিন অশান্তির কালো ছায়া স্পর্শ করবে না তাদের। মাসনার দিকে তাকিয়ে মাহিন ভাবে- এই মুখটা কখনও ঠকাবে না আমায়। এই মুখের দিকে তাকিয়ে জীবনের সব দুঃখ ভোলার চেষ্টা করব। এই মুখটা ছেড়ে যেতে পারব না কখনও।

চৈতি দু'জনকে সতর্ক করে বলে– সময় খুবই কম, তোমরা দ্রুত চলে যাও! তোমাদের সঙ্গে পরে কথা হবে। হয়ত দেখাও হবে। তোমাদের জন্য শুভকামনা রইল। দোয়া করি তোমরা সুখী হও। তবে কেউ কাউকে ভুল বুঝবে না কখনও। যত ঝড় আসুক না কেন, দু'জন-দু'জনকে আঁকড়ে থাকবে। বেঁচে থাকার সম্বল মনে করবে একে অপরকে।

১০৫

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষে মাওলানা মহসিন ক্লাসমেটকে ঢাকায় খেদমতের আগ্রহের কথা জানান। বলেন– আমার শশুর পরিবার সম্ভবত কয়েক বছর ঢাকায়ই থাকবেন। তবে তারা থাকুক চাই না থাকুক, আমি ভালো কোনো খেদমত পেলে স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা থাকব। ক্লাসমেট জানান– ঢাকায় চাকরির চেয়ে প্রার্থী কয়েকগুণ বেশি। যার জন্য ঢাকায় খেদমত হওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে আপনার যে যোগ্যতা, আশা করি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

আসর পর্যন্ত গল্প করেন তারা। আসর নামাযের পর আশপাশের বিভিন্ন মসজিদ-মাদরাসার আলেমদের সঙ্গে মাওলানা মহসিনকে পরিচয় করিয়ে দেন তার ক্লাসমেট এবং মাওলানা মহসিনের খেদমতের কথাও জানিয়ে রাখেন।

ক্লাসমেট থেকে বিদায় নিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হন মাওলানা মহসিন। পথিমধ্যে মাগরিবের নামায আদায় করার জন্য একটি মসজিদে প্রবেশ করেন তিনি। নামায শেষে পাশের একটি দোকান

থেকে শ্বশুর-শাশুড়ী ও সাবিনার জন্য কিছু কেনাকাটা করেন। কেনাকাটা শেষে দোকান থেকে বের হতেই হঠাৎ জাহিদুলের সঙ্গে দেখা! জাহিদুল দৌড়ে গিয়ে মাওলানা মহসিনকে জড়িয়ে ধরে।
–মহসিন ভাই আপনি এখানে?
মাওলানা মহসিনও জাহিদুলকে দেখে অবাক হন– তুমি ঢাকায় কেন?
–এ বছর ঢাকায় ভর্তি হয়েছি আমি; বলে জাহিদুল।

–ভাই আপনাদের পারিবারিক কী খবর? মাহিনের সঙ্গে অনেকদিন আমার সাক্ষাৎ নেই। মাঝে একবার ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখি বাড়িতে কেউ নেই। হয়তো কোথাও বেড়াতে গিয়েছিল। লেখাপড়ার চাপে পরে আর যাওয়া হয়নি।
প্রথমে মাওলানা মহসিন জাহিদুলকে ধন্যবাদ জানান সাবিনার মতো একটি মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক করে দেওয়ার জন্য। সাবিনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ মাওলানা মহসিন। সংসারে তাদের বোঝাপড়া এবং ভালোবাসার কথা শুনে অত্যন্ত তৃপ্তি পায় সে।

মাওলানা মহসিন ঢাকায় কেন এবং কীভাবে জানতে চায় জাহিদুল। মাওলানা মহসিন জাহিদুলকে সব ঘটনা খুলে বলেন। মাহিনদের ওপর এতবড় ঝড় বয়ে গেছে! আফসোস করে জাহিদুল।
জাহিদুল নিজ থেকেই মাওলানা মহসিনকে বলে– যেহেতু সাবিনারা ঢাকায় চলে এসেছে, আপনিও ঢাকায় থাকার চিন্তাভাবনা করেন। মাওলানা মহসিন মুচকি হেসে বলেন– আমার বিয়ের ব্যবস্থা যেহেতু তুমি করেছো, সেহেতু ঢাকায় থাকার ব্যবস্থাটাও তুমিই করো। জাহিদুল বলে ইনশাল্লাহ আমি পারব।

১০৬
চৈতিকে বিদায় দিয়ে মাসনাকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয় মাহিন। মাসনার একটু খারাপ লাগতে শুরু করে। 'যে মা-বাবা এত বছর আগলে রেখেছেন, দুঃখ পেতে দেননি, ভালো-মন্দ খবর রেখেছেন, আমার হাসিতেই যারা সুখ খুঁজেছেন, দুঃখ পেয়েছেন আমার দুঃখে, সেই তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি'! কিছুটা অপরাধবোধ কাজ করে তার মাঝে। কিন্তু সেটা মাহিনের ভালোবাসা থেকে বেশি নয়। ফলে অপরাধবোধ চাপা পড়ে যায় অন্ধ ভালোবাসার কাছে।

–তোমার কি মন খারাপ? সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তোমার মন খারাপী দূর করে দেবো আমি।

ইতোমধ্যে যে বাসে করে ঢাকায় যাচ্ছে মাহিন-মাসনা, সে গাড়িতে একজন হকার ওঠে। দুই হাতে হরেকরকম খেলনা। গাড়িতে উঠে হাঁক ছাড়েন– এই খেলনা লাগবে খেলনা? আপনার সন্তানের জন্য একটা খেলনা নিয়ে যান!

দাদাভাই! আপনার সন্তান আপনার সম্পদ। আপনার সন্তান আপনার ভালোবাসা। সন্তানের জন্য মা-বাবা জীবনও দিতে পারেন। আমি আপনার সন্তানের সামান্য আনন্দের উপলক্ষ নিয়ে হাজির হয়েছি। খুব অল্প মূল্যে আকর্ষণীয় সব খেলনা আপনার সন্তানের জন্য উপহার নিন। আপনার সন্তানকে দেখে রাখুন। সন্তানকে বুঝুন। সুখ-দুঃখে সন্তানের পাশে থাকুন। সময় দিন আপনার সন্তানকে। আপনার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও অফুরন্ত ভালোবাসা জমা রয়েছে সন্তানের মাঝে। সে ভালোবাসা গ্রহণ করুন। বাজে ছেলে-মেয়েদের আড্ডা থেকে আপনার সন্তানকে মুক্ত রাখুন। প্রেম-ভালোবাসা নামক অবৈধ সম্পর্ক থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখুন।

হকারের কথা শুনে মাসনা ভাবে, 'মা-বাবা আমাকে কত ভালোবাসতেন, সেই মা-বাবাকে এভাবে অপমান করে চলে যাচ্ছি, তারা কি কোনোদিন ক্ষমা করবেন আমায়'? হকারের কথায় সাময়িক নৈতিক চিন্তা-ভাবনা কাজ করলেও মাহিনের প্রতি প্রবল টান থাকায় ওসব চিন্তা-ভাবনা মাসনার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

১০৭

বাসায় ফিরতে হবে। দেরি হলে সাবিনা টেনশন করবে। তাই কথা না বাড়িয়ে বাসায় ফিরে যান মাওলানা মহসিন। ওদিকে মাওলানা মহসিন ও মাহিনের পথ চেয়ে বসে আছেন ঘরের লোকজন। মাহিন সন্ধ্যার মধ্যে আসার কথা। ফোনও দিচ্ছে না। ইতোমধ্যে বাসায় গিয়ে পৌঁছেন মাওলানা মহসিন। সাবিনা এগিয়ে যায়। মাওলানা মহসিনের হাত থেকে বাজারের ব্যাগগুলো নিয়ে যায়।

ব্যাগ খুলে দেখে মায়ের জন্য শাড়ি, বাবার জন্য লুঙ্গি-পাঞ্জাবী এবং সাবিনার জন্য বেশ কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়েছেন মাওলানা মহসিন। সাবিনা বেশ খুশি হয়। আমার জন্য এতকিছুর দরকার ছিল না। মা-বাবার জন্য এনেছেন তাতেই আমি খুশি। জমির উদ্দীন ও আমেনা বেগম আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

মাহিনের জন্য পাজামা-পাঞ্জাবী আনতেও ভোলেননি মাওলানা মহসিন।

–মাহিন ভাই আসেননি এখনও?

জানতে চান মাওলানা মহসিন। জমির উদ্দীন বলেন– এখনও আসেনি। ওর পথ চেয়ে বসে আছি সেই সন্ধ্যা থেকে। মাহিনের ফোনও বন্ধ।

চিন্তায় পড়ে যান সবাই। একের পর এক বিপদ লেগেই আছে তাদের সংসারে। তাই চিন্তা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

১০৮

পরদিন সন্ধ্যার গাড়িতে নিজ কর্মস্থল মাদরাসার উদ্দেশ্যে রওনা হন মাওলানা মহসিন। একটি ফোন আসে। মোবাইল হাতে নিয়ে দেখেন বড়ভাইর ফোন। সালাম বিনিময়ের পর বড়ভাই বলেন– তোমার ভাতিজিকে দেখতে আসবে কাল। তুমি রাতেই বাড়ি চলে এসো।

–ভাইয়া! আমি একটু ঢাকা গিয়েছিলাম। ব্যস্ততায় তোমাদের বলে যেতে পারিনি। এখন গাড়িতে আছি। কাল অবশ্যই থাকব ইনশাআল্লাহ; বলেন মাওলানা মহসিন।

যাতায়াত পথের একটি স্টেশনে মাদরাসার গাড়ি ছেড়ে বাড়ির গাড়ি ধরে ফজরের পরপর বাড়ি পৌঁছেন তিনি।

দুপুর নাগাদ ছেলেপক্ষ আসবে। ছেলে কী করে জানতে চান মাওলানা মহসিন। বড়ভাই বলেন– শুনেছি তেমন শিক্ষিত নয়, তবে ছেলে ভদ্র এবং একটি মসজিদের মুয়াজ্জিন।

–লেখাপড়া বড় কথা নয় ভাইয়া! বড় কথা হলো আদর্শ এবং ভদ্রতা। এই জামানায় ভদ্র ও আদর্শবান ছেলে-মেয়ে পাওয়া বড়ই দুষ্কর। চারিদিকে চরিত্রহীনদের জয়জয়কার। ভালো কথা বলার মানুষ কম, ভালো কথা শোনার মানুষও কম। ভালো মানুষগুলোকে খারাপ মানুষেরা একপেশে করে রাখে। ভালো মানুষের ভালো গুণগুলো এই সমাজের মানুষ মেনে নিতে পারে না। দেখো না! কত মানুষ শিক্ষিত হয়েও পশুর মতো আচরণ করে!

মাওলানা মহসিনের কথায় বড়ভাই চিন্তায় পড়ে যান। ছেলে ভালো না হলে মেয়েটার জীবন শেষ!

১০৯

সন্ধ্যার পরপর ঢাকায় পৌঁছে মাহিন-মাসনা। ঘর তো আগেই প্রস্তুত রাখা ছিল। মাসনাকে বাসায় রেখে হোটেল থেকে কিছু খাবার এনে দু'জন রাতের খাবার খেয়ে নেয়। দু'দিন পর থেকে কোচিং সেন্টারে মাহিনের ব্যাচ চালু হবে। রাতে দু'জনের মাঝে কথা হয় নানা দিক নিয়ে।

আজ ওদের মাঝে কোন বাধা নেই, স্বাধীন। দু'জন দু'জনকে খুব করে কাছে পেতে চায়। কিন্তু এখনও বিয়ে হয়নি। মাওলানা মহসিনের সংস্পর্শে মাহিনের মাঝে কিছুটা হলেও ধার্মিক ধার্মিক ভাব চলে এসেছে। মাহিন বলে– আগামীকালই কোচিং পরিচালকের মাধ্যমে কাজী অফিসে গিয়ে আমরা বিয়ে করে নেবো। এই বাসাটা তিনিই ঠিক করে দিয়েছেন। ভাড়াও দিতে হবে না। বাড়িওয়ালার সাতবছরের ছেলেকে একঘণ্টা পড়ালেই হবে।

–তাহলে তো বেশ হয়েছে। ছেলেটাকে আমিই পড়াব। তুমি কোচিংয়ে ব্যাচ পড়াবে; বলে মাসনা।

আগামী মাস থেকে চেষ্টা করো বড় কোনো বাসা নেওয়া যায় কী না।

একরুমে আমরা থাকব, বাকি রুমগুলোতে দুই-তিনটা কোচিং-এর ব্যাচ পড়াব। ছেলে-মেয়ে আলাদা ব্যাচ থাকবে। তুমি ছেলেদের পড়াবে, আমি মেয়েদের। দেখবে এতেই আমাদের বেশ চলে যাবে। মাসনার প্ল্যানটা খুব বেশ পছন্দ হয় মাহিনের।

মাসনা বেশ মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। সে টাকা দিয়েই আপাতত খরচটা চালিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করে তারা। গল্প করতে করতে এভাবেই রাত শেষ হয় মাহিন-মাসনার।

সকালে নাস্তা করে প্রথমে কাজী অফিসে গিয়ে বিয়ে করে নেয় মাহিন-মাসনা। মনে অন্যরকম উৎফল্লতা। তবে বিয়ে উপলক্ষে কাউকে কিছু বলতে পারছে না, কোনো উপহার দিতে পারছে না, আনন্দ ভাগাভাগি করতে পারছে না বলে কিছুটা আফসোস রয়ে যায় তাদের। মাসনা ভাবে- আমার বাসর হওয়ার কথা ছিল। সাবিনা নিজ হাতে আমার বাসর সাজিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভাগ্য আজ সহায় নেই আমাদের।

১১০

মাওলানা মহসিন বড়ভাইকে বলেন– ভাইয়া চিন্তা করো না, আশা করি সবকিছু ঠিকঠাকই হবে ইনশাআল্লাহ।

দুপুরের আগে ছেলেপক্ষ এসে হাজির হন। ভাতিজিকে দেখে পছন্দ করে ফেলেন এবং বিয়ের দিন ঠিক করে চলে যান তারা।

মাওলানা মহসিন ভাতিজিকে সামনে বসিয়ে নসিহত করেন– শোন মা! সংসার জীবন মধুরও হতে পারে, আবার কন্টকযুক্তও হতে পারে। এটা স্বামী-স্ত্রীর বোঝাপড়ার ওপর নির্ভর করে। তবে সুখের সংসার গড়তে রমণীকেই ভূমিকা পালন করতে হয়। বাড়িতে মেহমান আসবে, আত্মীয়-স্বজন আসবে, তাদের আপ্যায়নে কৃপণতা করা যাবে না। মুখ কালো করে থাকা যাবে না। অনেক সময় শ্বশুরবাড়ির লোকজন কটুকথা বলে ফেলবে, কিন্তু তাদের উত্তর দেওয়া যাবে না, কৌশলে এড়িয়ে যেতে হবে।

কারও সঙ্গে তর্ক করে ফলাফল ভাল হয় না। তর্কে সম্পর্কের মাঝে

দূরত্ব ঘটে। স্বামীর সঙ্গে কখনও তর্ক করবে না। উঁচু গলায় কথা বলবে না। অহঙ্কার প্রকাশ করবে না। এতে স্বামীর মনে তুমি ঢুকতে পারবে না। স্বামী কী চায় না চায় সেদিকে খেয়াল রাখবে। বিরক্ত হয় এমন কোনো বিষয়ে স্বামীকে জড়ানো যাবে না।

স্বামী অনেক সময় বড় আশা করে এবং আগ্রহ ভরে তোমাকে কোনো কাজের আদেশ করলে, কষ্ট হলেও সেটা করবে। স্বামীর সামনে নাকিকান্না ও আদিখ্যেতা করবে না। স্বামীর সহানুভূতি পেতে তার সামনে কান্নাকাটি করবে না। এতে হীতে বিপরীত হয়।

সবসময় স্বামীর সামনে হাসিমুখে থাকার চেষ্টা করবে। এতে তোমার প্রতি স্বামীর আত্মবিশ্বাস আস্থা ও ভালোবাসা অনেকগুণে বেড়ে যাবে। স্বামীকে কখনও কোনো বিষয় খোটা দিয়ে কথা বলবে না। এতে তুমি সুখি হতে পারবে না। চোখে চোখ রেখে রাগত স্বরে কথা বলবে না। ঝাড়া মেরে কিংবা অশ্রাব্য ভাষায় মন্তব্য করবে না। স্বামীর সামনে রাগ করে কোনো জিনিস ছুঁড়ে মারবে না। জোরে দরজা লাগাবে না। বাহির থেকে ফিরলে কোনো বিষয়ে নালিশ করবে না।

শোন মা! যার সঙ্গে সারাটা জীবন থাকতে হবে, তার সঙ্গে তিক্ততা বাড়ালে কিংবা তাকে ক্ষেপিয়ে সুখের মুখ দেখা যায় না। এই ছোট ছোট বিষয়গুলো মেনে চলতে পারলে সংসারটা দুনিয়ার জান্নাতে পরিণত হবে।

ভাতিজি চাচার কাছে দোয়া চায়, যেন তার কথাগুলো মেনে চলতে পারে।

১১১

ঐদিন সন্ধ্যায়ই মাদরাসায় চলে যান মাওলানা মহসিন। ছাত্ররাও চলে আসে। পরদিন সকালে যথারীতি ক্লাস শুরু হয়। মাওলানা মহসিন প্রিয়তমা সাবিনাকে ছেড়ে আর থাকতে পারছেন না। বারবার সাবিনার কথা মনে পড়ে তার। 'নাহ! ঢাকার কোথাও খেদমত নিতেই হবে। বিয়ে করেছি, কিন্তু স্বামী–স্ত্রী যদি একসঙ্গে না থাকি, সে বিয়ের কোনো মানে নেই। তা ছাড়াও সাবিনার মতো ভালো একটি মেয়ে ছেড়ে থাকা

যায় নাকি? স্ত্রী ব্যতিত জীবন পূর্ণতা পায় না। তবে মাদরাসা থেকে এক মাসের অগ্রিম বেতন নেওয়া আছে। ফলে আরও একমাস সেখানে থাকতে হবে'।

মাওলানা মহসিন স্পষ্টবাদী মানুষ। কিছু করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলাপ করেই করতেন। একদিন আসর নামাযের পর মাদরাসা কমিটির লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ করেন মাওলানা মহসিন– আমি ঢাকা যেতে চাই। আমার শ্বশুর পরিবার ঢাকায় আছেন। ঢাকা যেতে পারলে আমার জন্যও ভালো হবে। আপনারা অনুমতি দিলে আমি খুশি হব।

মাদরাসার সভাপতি মাওলানা মহসিনের ওপর শুরু থেকেই মুগ্ধ ছিলেন। তিনি বলেন– হুজুর! আপনি চাইলে যত বছর ইচ্ছা আমাদের এখানে থাকতে পারেন। আমরা সবাই আপনার ওপর খুশি। কিন্তু আপনার মতো লোক আমরা আর পাব কী না জানি না। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আপনি ঢাকা যেতে চাইলে আমরা ফিরাব না। বরং সহযোগিতা করব। এখান থেকে চলে গেলে আমাদের ভুলে যাবেন না। মাঝে মাঝে আমাদের এখানে বেড়াতে আসবেন।

কমিটির সভাপতির কথায় যারপরনাই খুশি হন মাওলানা মহসিন। এর মাঝেই জাহিদুলের ফোন চলে আসে। সালাম বিনিময়ের পর জাহিদুল বলে– খুশির খবর আছে মহসিন ভাই!

–কী খুশির খবর?

জানতে চান মাওলানা মহসিন।

–একটি মাদরাসা আছে। মোটামুটি মাঝারি ধরণের। ছাত্রসংখ্যাও খারাপ নয়। মাদরাসার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং মাদরাসা মসজিদে জুমা পড়াতে হবে। আমি তাদেরকে বলে রেখেছি, আপনি চাইলে এশার পর কমিটির সঙ্গে কথা বলিয়ে দেবো।

বাদ এশা ঢাকার কমিটির লোকদের সঙ্গে কথা হয় মাওলানা মহসিনের। মোবাইলে কথা বলেই কমিটির লোকেরা বুঝে ফেলেন তারা একজন ভালো পরিচালক ও খতীব পেতে যাচ্ছেন। পরের মাসের ১ তারিখ থেকে খেদমতে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কথা পাকাপোক্ত হয় তাদের মাঝে।

সঙ্গে করে নিয়ে আসা মাসনার টাকা থেকে মাহিনদের বাসার সামনে চা-দোকানী ও কোচিং পরিচালকের ঋণ শোধ করে বাসার উদ্দেশ্যে বের হয় মাহিন।
বাবা জমির উদ্দীন কৌতুহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন –তুই কোথায় ছিলি? বাসার সবাই টেনশন করেছে। এসেছিস কখন?
–গতকালই এসেছি। কোচিং সেন্টার গোছানোর কাজে ব্যস্ত ছিলাম। রাত বেশি হওয়ায় ওখানেই ঘুমিয়েছি।
–যে কাজের জন্য বাড়ি গিয়েছিস তা সম্পন্ন হয়েছে কী?
–সবকিছু ঠিকভাবেই হয়েছে বাবা।
–আলহামদুলিল্লাহ।
এদিকে সিরিয়াস মুডে মাহিনকে ডেকে নেয় সাবিনা। জানতে চায় মাসনার সঙ্গে মাহিনের দেখা হয়েছে কী না। মাহিন বিষয়টা গোপন রাখে। কারণ সাবিনা প্রথমে সম্পর্কটার পক্ষে থাকলেও পরে আর মত দেয়নি। তাই মাহিন সরাসরি অস্বীকার করে বলে– মাসনার কথা তো একপ্রকার ভুলেই গিয়েছি।
সাবিনা খুব দরদ নিয়ে মাহিনকে বলে– ভাইয়া মাসনার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখিস না। কারণ বিয়ের আগের সম্পর্ক ভালো নয়। এসব সম্পর্কে জীবন নষ্ট হয়।
দুপুরে খাবার দস্তরখানে মাহিন বলে– বাসায় যেহেতু রুম কম, আমাদের থাকতেও কষ্ট হয়, তাই আমি চাচ্ছি কোচিং সেন্টারে একটা রুমে রাতে থাকার জায়গা করতে। দিনে এসে তোমাদের দেখে যাব।
জমির উদ্দীন জানতে চান– জায়গাটা থাকার জন্য উপযোগী কী না।
– পুরোপুরি উপযোগী বাবা; বলে মাহিন।
সবার থেকেই আসল ঘটনা লুকিয়ে এভাবেই মিথ্যার আশ্রয় নেয় সে।

১১৩

চলে যায় আরও একদিন। কোচিং সেন্টারে মাহিনের প্রথম ক্লাস আজ। প্রথমদিনেই ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ মুগ্ধ। এভাবে চলতে থাকে মাসখানেক। পাশাপাশি ভালোই চলে মাহিনের নতুন সংসারও। মা-বাবা, ভাই-বোন কেউই জানেন না মাহিন কোচিং ছাড়া কী করছে।

ওদিকে মাসনার মা-বাবা মাসনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি, কলেজ, বান্ধবীদের বাড়ি, কোনো জায়গা বাদ রাখেননি তারা। সব জায়গায় খোঁজেন কলিজার টুকরা মাসানাকে। উপায়ান্তর না পেয়ে থানায় মেয়ে নিখোঁজের ডায়েরি করেন বাবা।

এদিকে হঠাৎ প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন আমেনা বেগম। জমির উদ্দীনও পুরোপুরি সুস্থ নন। বয়স হয়ে গেছে। জীবনের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে, তাতেই কাবু হয়ে যান জমির উদ্দীন। দেখা-শোনা করার মাহিন ছাড়া কেউ নেই।

মাহিন মাসনাকে বুঝিয়ে বলে– মা প্রচণ্ড অসুস্থ। কয়েকদিন মায়ের পাশে থাকতে হবে আমাকে। সময় দিতে হবে। কোচিং সেন্টারে আমার ব্যাচ অন্য কেউ পড়াবে। তিন-চারদিন তোমার একা থাকতে হবে। টেনশন করো না, সমস্যা হলে আমাকে জানাবে।

এই বলে চলে যায় মাহিন।

১১৪

কিন্তু দুদিন পরই মাহিনকে অবাক করে নতুন চরিত্র নিয়ে হাজির হয় মাসনা। ফোন করে বলে– এই বাসায় আমি থাকতে পারব না। একা একরুমে অন্ধকার গুদামের মধ্যে আমার থাকা সম্ভব নয়। তুমি ইচ্ছা করেই আমাকে এখানে ঢুকিয়েছ। আমার বাবা কোনোদিন আমাকে এমন কষ্টে রাখেননি। তোমার মা-বাবা বোনকে তো ঠিকই ভালো বাসায় রেখেছ! তাহলে আমাকে এখানে কেন।

মাহিনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে! মাসনার এমন ব্যবহার নিতে পারেনি সে।

ভেবে পায় না হঠাৎ মাসনার এ পরিবর্তন কেন? ও তো সবকিছু

জেনেশুনেই আমার সঙ্গে এসেছে এবং তা ওর ইচ্ছায়ই!
অবশ্য সাংসারিক জীবনের শুরু থেকেই টুকটাক তর্কবিতর্ক শুরু হয় তাদের মাঝে। তবে মাসনা এতটা বদলে যাবে, তা মাহিন ভাবেনি। মাহিন অনুমাণ করে, মা-বাবার কাছে থাকাটা হয়ত পছন্দ করে না মাসনা। বিষয়টা যদি এমনই হয়, তবে তা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাকে যদি মা-বাবা থেকে দূরে রাখার চিন্তাভাবনা থাকে, তবে সে ভুল করবে। কিন্তু এতদিন তো তেমন কোনো আলামত পাইনি। তাহলে?
মাহিন হতভম্ব হয়ে যায় মাসনার ইউটার্নমূলক ব্যবহারে। মা-বাবার সঙ্গে তুলনা! মনে প্রচণ্ড কষ্ট পায় সে। সবার সামনে কোনো উত্তর দিতে না পেরে ফোন রেখে দেয়। কিন্তু মাসনা ফোন দিয়েই যাচ্ছে। যতবার কেটে দেয়, ততবার ফোন করে। মাহিন রিসিভ করে ছোট্ট করে বলে– আমি ব্যস্ত। আমার সামনে সবাই বসে আছে। মা অসুস্থ। পরে কথা বলব।

কিন্তু আবার ফোন! বুঝতে চাইছে না, ফ্যামিলিগত সমস্যা নিয়ে বাইরে ফোনে কথা বলা সম্ভব হয় না। সম্মান ও ব্যক্তিত্বের দিকে লক্ষ্য করে ফোন বন্ধ করে দেয় মাহিন। এরপর শুরু হয় মেসেজ! যা মুখে আসে তা লিখে মেসেজ করে মাসনা– আমাকে বাড়ি দিয়ে এসো! আমি তোমার সঙ্গে থাকব না! এই পরিবেশে থাকা সম্ভব নয়! তুমি আমাকে কেয়ার করো না! তুমি তোমার মা-বাবা নিয়েই পড়ে থাকো! এ অবস্থায় তোমার সঙ্গে আমার থাকা সম্ভব নয়! আমার বাসায় কোনো মালামাল নেই, এই মুহূর্তে বাসার জন্য আলমারি-ফ্রিজ নিয়ে এসো! আমি জানি তোমার কাছে অনেক টাকা, কিন্তু আমার কাছে স্বীকার করো না! তোমার মা-বাবার জন্য ঠিকই খরচ করো!
মাসনার প্রত্যেকটা শব্দ যেন তীর হয়ে বুকের একদিক থেকে ঢুকে আরেকদিক দিয়ে বেড়িয়ে যায়। মাহিনের দম বন্ধ হয়ে আসে। কিছু বলতেও পারছে না, সহ্যও করতে পারছে না, এতবড় কষ্ট আর কখনও পায়নি মাহিন।

১১৫

অসুস্থ মাকে বিছানায় রেখেই বাসায় চলে যায় মাহিন। অগ্নিশর্মা হয়ে আছে মাহিন। তবুও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রেখে ভদ্রভাবে মাসনার কাছে জানতে চায়– হঠাৎ তার এমন দুর্ব্যবহারের কারণ কী?

মায়ের সঙ্গে তুলনা! এটা তার থেকে আশা করেনি মাহিন।

মাসনা বলে– যেহেতু আশা করোনি, ওকে! তাহলে আমাকে আমার বাড়িতে দিয়ে এসো। মা-বাবা ছাড়া আপন কেউ নেই। তোমাকে ভালোবেসে ভুল করেছি। তুমি আমাকে সুখ দিতে পারবে না। এই কোচিংয়ের টাকা দিয়ে আমার হবে না।

মাহিন বলে– এমন কথা ছিল আমাদের? কথা ছিল, সুখে-দুঃখে দু'জন পাশাপাশি থাকব, একে অপরকে বুঝব, সমস্যাগুলো সমাধান করব, কিন্তু হঠাৎ তুমি এমন আচরণ কেন করছো!

–এমন আচরণ করব না তো নাচব?

চিৎকার দিয়ে বলে মাসনা। মাহিন চুপ থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু মাসনার মুখ চলতেই থাকে। মুখে যা আসে তাই বলে যায় সে। মাহিন বার বার নিষেধ করে। কিন্তু তাতে আরও ক্ষেপে যায় মাসনা। মাহিনের মুখের সামনে আঙুল উঁচু করে "তোমার শেষ দেখে ছাড়ব" বলে হুমকি দেয়। এবার মাহিন শক্তভাষায় ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলতে অনুরোধ জানায় আবার। কিন্তু মাসনা মাহিনের মুখের ওপর বলে– তোমরা কতদূর ভদ্র আমি জানি। আমাকে ভদ্রতা শেখাতে এসো না! ভদ্র হলে তোমার ভাই অন্যের বউ ভাগিয়ে নিয়ে যেত না! তোমাদের চরিত্র আমার দেখা হয়ে গেছে।

মাহিনের রক্ত মাথায় উঠে যায়। সবকিছু জানার পরও এভাবে খোটা দিয়ে কথা! রাগে কাঁপতে থাকে মাহিন। বাধ্য হয়ে মাসনার গায়ে হাত তোলে সে।

চিৎকার করে কাঁদতে থাকে মাসনা। এমন ভাব করে, মনে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার ওপর নির্যাতন চলেছে। বাড়িওয়ালার স্ত্রী চলে আসেন– কী হয়েছে তোমাদের? মাত্র এলে, নতুন বিয়ে হলো, এখনই মারামারি! মাহিন বলে– আন্টি ও যে ভাষায় কথা বলে, তা আপনারও সহ্য হবে না। আমার মায়ের সঙ্গে তুলনা দিয়ে কথা বলে ও। মা অসুস্থ। আমি ছাড়া আমাদের পরিবারে দেখা-শোনার কেউ নেই। মা'র অসুস্থার কারণে দুইদিন বাসায় না আসার কারণে এই অশান্তি শুরু করে। সবকিছু জানার পরও ও আমাকে খোটা দিয়ে কথা বলে। ওর কথা হচ্ছে ওকে নিয়েই আমার ব্যস্ত থাকতে হবে। ওর ভাব এমন, ও-ই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। নাকিকান্না আদিখ্যেতা ও ওভার এ্যাকটিং-এ আমি এই একমাসেই হাঁপিয়ে উঠেছি। কিন্তু ও এতটা নিচে নামতে পারে তা কল্পনায়ও ছিল না।

মাঝে মাঝে অন্যায় করে ক্ষমাও চায়, কিন্তু একটু তর্ক হলেই আবার সেই অন্যায়গুলোকে আমার মাথায় চাপিয়ে আমাকে দোষারোপ করে! বাইরে নানা ব্যস্ততায় থাকি। ঐ সময় ফোন দিলে যদি বলি ব্যস্ত বা ফোন কেটে দিই, তখন শুরু হয় আরেক ট্রাজেডি! ফোন দিয়ে দিয়ে পাগল করে দেয়! এত বুঝিয়েছি লোকজনের সামনে ফ্যামিলিগত সমস্যা নিয়ে কথা বলা অসুন্দর দেখায়, কিন্তু কে শোনে কার কথা। বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে লোকজনের সামনেই ওকে ধমকাতে হয়। আর এতে সবাই জানে আমার সংসারটা কেমন চলে ও আমার স্ত্রী কেমন? এই লজ্জা কোথায় রাখি বলুন আন্টি?

মাহিনের চোখে পানি চলছল করে।

–তাই বলে এত না মারলেও পারতে বাবা!

–কোথায় এত মেরেছি? ওর অশ্রাব্য ভাষা সহ্য করতে না পেরে একটা থাপ্পড় মেরেছি মাত্র।

মাহিনের জবানবন্দী শুনে বাড়িওয়ালা মহিলা হতবাক!

–কিন্তু তোমার স্ত্রী যেভাবে কাঁদছে, তাতে তো মনে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্যাতন করা হয়েছে!

–এ দুঃখ কাকে দেখাব আন্টি! দেখুন কীভাবে চিৎকার দিয়ে কাঁদছে। মহিলারা এভাবে কাঁদে! আমার সম্মানের কথা ওর মাঝে মোটেও নেই।

সামান্য বিষয়কে লম্বা বানিয়ে বড়ধরণের ঝামেলা না পাকালে ওর ভালো লাগে না। ওর দেওয়া টেনশনে বাইরে গিয়ে সুষ্ঠুভাবে কোনো কাজ করতে পারি না। ওকে যত অনুরোধ করি, তত বেপরোয়া হয়ে ওঠে। প্রত্যেক পশমের গোড়ায় হিংসা আর অহঙ্কার ওর।

যে বিষয়টা বেশি অপছন্দ, সেইটাই বেশি বেশি করে এবং তা ইচ্ছা করেই। আমি চুপসে গেলেও ওর নাকিকান্না আর গালাগালি চলতেই থাকে। এমন এমন কথা বলে, ঠাণ্ডা মানুষের রক্তও গরম হয়ে যাবে।

আমি ওর ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছি এতদিন। ভেবেছি, যে মেয়েটি বাবার বাড়ি থাকতে রাজরানীর মতো সময় কাটায়, সে মেয়েটা স্বামীর বাড়ি গিয়ে পুরো ঘর গোছানোর দায়িত্ব পালন করে। বাবার বাড়ি থাকতে যে মেয়েটার হাতে চুলার কালি লাগে না, স্বামীর বাড়ি গিয়ে সেই মেয়েটা সারাদিন রান্না ঘরে পড়ে থাকে।

সাবালেকা হওয়া পর্যন্ত যে মেয়েটা বাবা-মা'র আদরে থাকে, বিয়ের পর সেই মেয়েটা মা-বাবা ছেড়ে স্বামীর ভালোবাসার কাঙাল হয়। বাবার বাড়ি থাকতে যে মেয়েটা সবার শেষে ঘুম থেকে ওঠে, বিয়ের পর সেই মেয়েটা রাতে সবার শেষে বিছানায় যায় এবং সকালে সবার আগে ঘুম থেকে ওঠে। তার জীবনের সব স্বাদ-আহ্লাদ আর স্বপ্ন ঐ স্বামীর বাড়ি নিয়ে। শুধু স্বামীর বাড়ির মানুষগুলোকে একটু খুশি রাখার জন্য।

এসব ভেবে আমি সবসময় চেয়েছি মাসনাকে কোনো কষ্ট পেতে দেবো না। কিন্তু আমি যা ভাবি, ও তার উল্টোটা ভেবে বসে থাকে। এভাবে কি কোনো সংসার চলে?

বাড়িওয়ালা মহিলা মাসনাকে বুঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে তার সঙ্গেও রেগে যায়! তিনি মাহিনকে বলেন– বাবা তোমার স্ত্রীকে দ্রুত মানসিক ডাক্তার দেখাও! ওর নিশ্চয়ই মানসিক সমস্যা রয়েছে। নাহয় এমন দুর্ব্যবহার কোনো নারীর পক্ষে শোভা পায় না।

এই বলে চলে যান তিনি।

এভাবেই চলতে থাকে আরও একমাস। মাসনা যে বলেছিল পরবর্তীমাসে বড়বাসা নিয়ে কোচিং সেন্টারের ব্যাচ বাড়িয়ে নতুন করে জীবন শুরু করবে, মাসনার ব্যবহারে সে স্বপ্ন ফিকে হয়ে যায় মাহিনের।

মাসনার সঙ্গে বনিবনা হয় না তার। মনের কষ্টটা কাউকে বোঝাতেও পারে না। এভাবে চলতে চলতে কয়েকদিনের মাথায় হঠাৎ একটা অশুভ কালো ছায়া এসে সবকিছু এলোমেলো করে দেয় মাহিনের। মাহিন অসুস্থ মায়ের পাশে বসা। একদল পুলিশ এসে হাজির মাহিনদের বাসায়!

জমির উদ্দীন জানতে চান পুলিশ কেন? কেউ কিছু বলতে পারে না। পুলিশের একজন জিজ্ঞেস করেন– আপনি জমির উদ্দীন?

–হ্যাঁ, আমি জমির উদ্দীন।

সবাই ভেবে নেয় হয়ত রাশেদের প্রথম স্ত্রী আবার কোনো মামলা করেছে। কিন্তু না, এটা ভিন্ন মামলা।

–মাহিন নামে আপনার কোনো ছেলে আছে?

মাহিন দাঁড়িয়ে বলে– আমিই মাহিন।

–আপনার নামে ওয়ারেন্ট ওয়ার্ডার আছে!

কেঁদে ওঠেন আমেনা বেগম। বলেন– কিসের ওয়ারেন্ট ওয়ার্ডার? আমার মাহিন কী করেছে?

–নারী নির্যাতন! নারী নির্যাতনের মামলা হয়েছে আপনার ছেলে মাহিনের নামে।

সবাই অবাক! মাহিন বুঝে ফেলে নিশ্চয়ই মাসনা মামলা করেছে। আমেনা বেগম জানতে চান– বাবা তোর থেকে এমন কিছুই হতে পারে না। তোর ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে। তুই বল সব মিথ্যা!

জমির উদ্দীনসহ ঘরের সবাই কাঁদেন। ভেতরের ঘরে কেঁদে বুক ভাসায় সাবিনা। আমাদের সংসারে ক'দিন পরপরই এতবড় খড়্গ নেমে আসে কেন?

পর্দার ভেতর থেকে পুলিশ টিমকে সাবিনা সবিনয় অনুরোধ জানায়– আপনারা মেহেরবানী করে অল্প সময়ের জন্য বাইরে গেলে ভাইয়ার সঙ্গে একটু কথা বলব।

মাহিন কী করেছে জানতে উদ্গ্রীব সাবিনা। পুলিশ টিম বাইরে গিয়ে দাঁড়ান।

১১৮

–ভাইয়া কী হয়েছে বল!

মাহিন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। সবার একই প্রশ্ন– মাহিন কথা বল! কিসের নারী নির্যাতন? তুই এমন ছেলেই না। তোকে আমরা চিনি। কারা ষড়যন্ত্র করেছে বল?

মাহিনের নিরবতায় সবাই বুঝতে পারে, নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে। সাবিনা মাহিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়– ভাইয়া মাসনার সঙ্গে তোর রিলেশন আছে এখনও?

জমির উদ্দীন ও আমেনা বেগম বিস্ময়কণ্ঠে জানতে চান– কোন মাসনা? তুই কিছু জানিস নাকি সাবিনা?

এবার সাবিনাও চুপ হয়ে যায়। জমির উদ্দীন রাগতস্বরে জিজ্ঞেস করেন– কী হয়েছে? কথা বলছ না কেন?

বাধ্য হয়ে পুরো ঘটনা খুলে বলে মাহিন। সবকিছু শুনে জমির উদ্দীন একটা চিৎকার দিয়ে মাটিতে বসে পড়েন।

সাবিনা বলে– ভাইয়া! তোকে বারবার নিষেধ করেছি, বিবাহপূর্ব এসব অবৈধ সম্পর্কের শেষটা ভালো হয় না। ভাইয়া তুই মানলি না। তোকে পুলিশ নিয়ে গেলে আমাদের কে দেখবে! মা অসুস্থ, বাবার বয়স হয়ে গেছে।

হৃদয়বিদারক এক পরিবেশের সৃষ্টি হয় মাহিনদের বাসায়। পুলিশ ধরে নিয়ে যায় মাহিনকে। মাহিনের পথপানে তাকিয়ে থাকেন বাবা–মা ও একমাত্র বোন সাবিনা...

১১৯

একটি স্বস্তি ও আনন্দের খবর নিয়ে রাতের খাবার দস্তরখানে মাওলানা মহসিন। খাওয়া-দাওয়া শেষে সাবিনাসহ পরিবারের সবাইকে খুশির সংবাদটা জানাবেন বলে নিয়ত করে রাখেন তিনি। এর মাঝেই সাবিনার ফোন। ফোন রিসিভ করতেই শুধু কান্নার আওয়াজ শুনতে পান মাওলানা মহসিন। কিছুটা ভয় পেয়ে যান তিনি।

–কী হয়েছে? এত কান্নাকাটির আওয়াজ কেন? কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি তো? বাবা-মা ঠিক আছেন?

–মাহিন ভাইয়াকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

–কী বলো! কেন কী কারণে?
জানতে চান মাওলানা মহসিন। সাবিনা বলে– নারী নির্যাতনের মামলা। আপনি যা বার বার আমাকে বলেছেন; বিবাহপূর্ব অবৈধ সম্পর্কের শেষফল সুখকর নয়, সেটাই মাহিন ভাইয়ার জীবনে ঘটেছে।
–এমন কোনো আলামত তো মাহিন ভাইর মাঝে পাইনি। তাহলে কেমনে কী?
–আমি জানতাম কিছুটা। ভাইয়াকে বার বার নিষেধ করেছি। পরে ভাইয়ার চাল-চলনে মনে হয়েছে ও এই পথ থেকে ফিরে এসেছে। কিন্তু আসেনি। ওর কর্মের ফল এখন মা-বাবাকে ভোগ করতে হবে। মা অসুস্থ, বাবা দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আমি একা একটা মেয়ে কী করব বুঝতে পারছি না।
–চিন্তা করো না। আমি ঢাকায় চলে আসার ব্যবস্থা করছি। আমার ঢাকাতে খেদমত হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। দুঃখের মাঝেও একটি আনন্দের খবর পেয়ে কিছুটা স্বস্তি পান মাহিনের পরিবার।

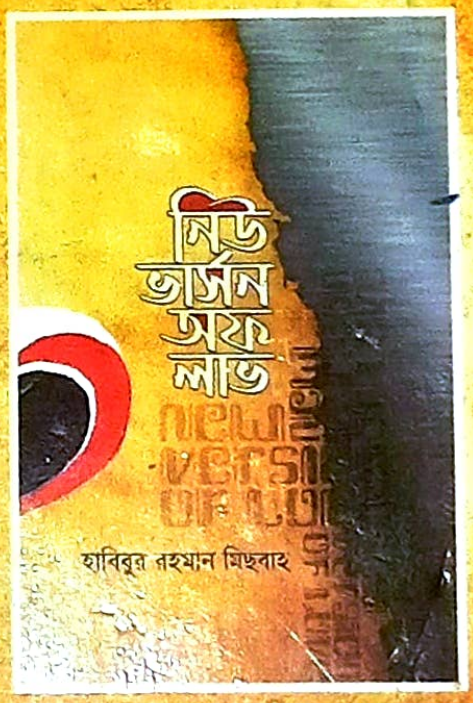
১২০

মাওলানা মহসিন পরদিন বাদ ফজর আবার কমিটির সঙ্গে বসেন। সবকিছু খুলে বলেন। কমিটির লোকজন সবকিছু শুনে দুপুরে কমিটির সবাইকে ডাকেন। উপস্থিত একটি জমকালো অনুষ্ঠান করে একবছরের বেতন হাদিয়াস্বরূপ দিয়ে সসম্মানে বিদায় জানান মাওলানা মহসিনকে। ছাত্র, কমিটির লোকজন ও এলাকাবাসীর ভালোবাসার কান্নায় বিদায় নেন মাওলানা মহসিন।
নতুন জীবনের পথে মাওলানা মহসিন। নতুন স্বপ্নের পথে মাওলানা মহসিন। প্রিয়তম স্বামীর পথ চেয়ে অপেক্ষার প্রহর গোনে এক পূণ্যবতী স্ত্রী সাবিনা...

১২১

রাশেদের কোনো খোঁজ-খবর মেলেনি এখনও। এদিকে সেই প্রবাসী ব্যক্তি, যার স্ত্রী রাশেদের সঙ্গে পরকীয়া করে চলে গেছে, সেই প্রবাসী দেশে ফিরেছেন। এতদিন লজ্জা ও ঘৃণায় দেশে ফেরেননি। সন্তানের আহাজারীতে আর থাকতে পারেননি। সন্ধানে নেমেছেন চলে যাওয়া স্ত্রীর। তবে স্ত্রী হিসেবে ফিরে পাওয়ার জন্য নয়, সন্ধান চলছে ভিন্ন কারণে...

অসমাপ্ত



আত তাকওয়া পাঠাগার
৩০৮ দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ১২৩৬
০১৯৪১-৬৮৬৪৯৫, ০১৭১২-৩৭৯৭৪৮

Cover Design : Hashem Ali
01855 87 64 70, 01913 84 49 91